বিজ্ঞানের আলোয় সংস্কারমুক্ত যৌনতা

ডাঃ ভবানীপ্রসাদ সাহু

Z.S

বিজ্ঞানের আলোয় সংস্কারমুক্ত যৌনতা

ডাঃ ভবানীপ্রসাদ সাহু

দীপ প্রকাশন ❑ কলকাতা-৭০০ ০০৬

BIGNANER ALOY SANSKARMUKTA JOUNATA

By

Dr. Bhabani Prasad Sahoo

প্রথম প্রকাশ : বইমেলা ২০০৬ • প্রচ্ছদ : রঞ্জন দত্ত
প্রকাশক : শংকর মণ্ডল
দীপ প্রকাশন, ২০৯এ বিধান সরণি, কলকাতা ৭০০ ০০৬
বর্ণসংস্থাপন : আই. ই. আর. ই. ২০৯এ বিধান সরণি, কলকাতা-৭০০ ০০৬
মুদ্রক : কমলা প্রেস, ২০৯এ বিধান সরণি, কলকাতা-৭০০ ০০৬
দাম : ৫০ টাকা

উৎসর্গ

যাঁদের ভালবাসা আর সফল মিলনের ফসল আমি,
সেই আমার প্রিয় মা ও প্রয়াত বাবা-কে

স্মরণ

পঞ্চ পান্ডব ও যিশুখ্রীষ্ট-কে
—যাঁদের জন্ম
বিবাহ-বহির্ভূত যৌন সম্পর্ক
ও
প্রাক্-বিবাহ যৌনমিলনের ফলে

সূ চী প ত্র

১।	যৌনতা	১
২।	যৌনতা, প্রেম ও বিবাহ	৩
৩।	প্রজননের প্রয়োজনে যৌনতা	৮
৪।	প্রজননের প্রত্যঙ্গগুলি	১০
৫।	যৌন মিলনের কথা	৩০
৬।	প্রাকবিবাহ যৌনতা ও বয়ঃসন্ধিতে যৌন মিলন	৪৭
৭।	উচ্ছেদ হোক 'সতীচ্ছদ'	৫৬
৮।	হস্তমৈথুন কি পাপ?	৫৮
৯।	জরায়ু বাদ মানে নারীত্বের অবসান নয়	৬৩
১০।	ঋতুমতী তুমি 'অশুচি' নও	৬৫
১১।	গর্ভাবস্থা না পেটে কৃমি	৬৯
১২।	সন্তানহীনতার চিকিৎসায় মাটি, মাদুলি বা মানৎ করা নয়	৭৩
১৩।	মৌলবাদের জরায়ুসর্বস্বতা	৭৭
১৪।	প্রজনন বিজ্ঞান প্রশিক্ষণ—সচেতনতা ও সম্মানের শিক্ষা	৮০

এই লেখকের অন্যান্য বই

ভূত-ভগবান-শয়তান বনাম ডঃ কোভুর
সংস্কার-কুসংস্কার
আস্তিক-নাস্তিক
জানতে চাই (প্রসঙ্গ: বিশ্বাস ও সংস্কার)
নারী: অস্তিত্ব ও সংস্কার
হিন্দু মৌলবাদ
ধর্ম-সাম্প্রদায়িকতা-মৌলবাদ
অধার্মিকের ধর্মকথা
ধর্মের উৎস সন্ধানে (নিয়ানডার্থাল থেকে নাস্তিক)
মৌলবাদের উৎস সন্ধানে
কুসংস্কারের উৎস সন্ধানে
অলৌকিকতা বনাম বিজ্ঞান
টম্যাটো ভগবান ও হাইব্রোডেশ্বর
মানব সন্তান ঈশ্বর ও অন্যান্য প্রসঙ্গ
বৈজ্ঞানিক কুসংস্কার
মানুষের জন্য বিজ্ঞান না বিজ্ঞানের জন্য মানুষ
বিজ্ঞানের চোখে ভগবান
এখনো সংস্কার এখনো কুসংস্কার
অপবিজ্ঞান-অপসংস্কার
স্বাস্থ্য ও সংস্কার
প্রকৃতি ও সংস্কার
খাদ্য-অখাদ্য সংস্কার-কুসংস্কার
শরীর ঘিরে সংস্কার
দুই বাংলা, হায় ধর্ম!
দুই বাংলার কুসংস্কারবিরোধী বিজ্ঞান চিন্তা (সম্পাদিত)
সোনালী সুলেখাদের কথা (পুস্তিকা)
শুক্র যখন কুসংস্কার (পুস্তিকা)
ডাইনি বলে কিছু নেই (ঐ)
ভূত বলে কিছু নেই (ঐ)
কোন্‌টা মানবো কোন্‌টা মানবো না (ঐ)
কোন্‌টা করবো কোন্‌টা করবো না (ঐ)
সুরা-শরীর-সর্বনাশ (রবীন্দ্র পুরস্কার প্রাপ্ত)
এইডস—ঘৃণা নয়, চাই সতর্কতা
কোন্ ওষুধ কেন খাবেন না
শরীর স্বাস্থ্যের টুকিটাকি
ওষুধ খেয়ে অসুখ
বিষয়: ড্রাগ
আকুপাংচার
Hand Book of Recent Acupuncture Treatment
ম্যালেরিয়া, অ্যানথ্রাক্স, প্লেগ (পুস্তিকা)
মেয়েদের আত্মরক্ষার কৌশল (অনূদিত)

মুখবন্ধ

আমাদের পিতামাতার সফল যৌনমিলনের ফসল আমরা। আমাদের পিতামাতার যদি পরস্পরের প্রতি আগ্রহ ও ভালবাসা না থাকত, তাঁরা যদি যৌন আকাঙ্ক্ষাহীন হতেন, এবং মিলিত না হতেন, তবে আমরা জন্মাতামই না। আমরাও একইভাবে রেখে যাব আমাদের উত্তরসূরী। সমস্ত ধরনের প্রাণেরই প্রাথমিক লক্ষণ একদিকে যেমন যেভাবে হোক খাদ্য সংগ্রহ করে নিজেদের বাঁচিয়ে রাখা, তেমনি প্রজননের মাধ্যমে নিজেদের বংশবৃদ্ধি করা তথা নিজেরই মত আরেকজনকে রেখে যাওয়াও। অর্থাৎ ক্ষুধা ও যৌনতা যদি না থাকত তবে এই পৃথিবীর বুকে আমাদের মত প্রাণীর অস্তিত্বই থাকত না।

তবে কি খাদ্যগ্রহণ, কি যৌনতা—সব ক্ষেত্রেই অন্যান্য প্রাণী থেকে মানুষের গুণগত পার্থক্য রয়েছে। বাঘ-ও মাংস খায়। কিন্তু মানুষ মাংসের কিমা থেকে শিককাবাব নানা কিছু করেই যায়। কোন গরু ঘাসের বড়া বানানোর কথা ভাবে না। মানুষ সাধারণ শাকপাতারই হরেক রকম রান্না করে। অন্যান্য প্রাণীর ক্ষেত্রে স্রেফ যৌনমিলন, বড় জোর একটু পূর্বরাগই যথেষ্ট। মানুষ তার মধ্যে চাঁদ-পাতা-ফুল-কাব্য-প্রেম থেকে শুরু করে 'নীল ছবি' আর নানা ভঙ্গীর যৌনমিলন আবিষ্কার করেছে।

খাদ্য সম্পর্কে সম্যক জ্ঞানের অভাব ঘটলে ঘটে নানা বিপত্তি। যৌনতা সম্পর্কেও একই কথা। অতিভোজন তথা উচ্ছৃঙ্খল খাদ্যগ্রহণের কারণে স্থূলতা, ডায়াবেটিস, হৃদরোগ থেকে অকালমৃত্যু নানা কিছুই ঘটে। অতি যৌনতা তথা উচ্ছৃঙ্খল যৌন আচরণও ডেকে আনে ব্যক্তি ও সমাজের নানা বিপদ—হতাশা, আত্মহত্যা, মানসিক বন্ধ্যাত্ব থেকে শুরু করে এইডস ও নানা ধরনের যৌনরোগের প্রসার। একদল মানুষ গরুর মাংস খাওয়াকে ধর্মবিরোধী এবং আরেকদল শুয়োরের মাংস খাওয়াকে ধর্মবিরোধী মনে করে পরস্পরের মধ্যে মারামারি করে। একইভাবে এই ধর্মের ছেলে ওই ধর্মের মেয়েকে বিয়ে করেছে, তথা তার সঙ্গে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করেছে,—এই অপরাধে তাদের হত্যা করা হয়। চন্দ্রগ্রহণ-সূর্যগ্রহণের সময় খাদ্য গ্রহণ উচিত নয়—এমন সংস্কারে ভোগা মানুষ এখনো কম নেই। হস্তমৈথুন করা অন্যায়, বীর্য তথা শুক্র হল শরীরের অতি মূল্যবান সার অংশ, ঋতুমতী মেয়ে অশুচি—এমন ধরনের অজস্র কুসংস্কারেও ভোগে অসংখ্য মানুষ ও মানুষী। বেগুন, উচ্ছে, শাকপাতা, কচু, ডাল, ছাতুর মত সাধারণ খাবারদাবারই যে যথেষ্ট পুষ্টিদায়ী এই বোধ না থাকায়, অপ্রয়োজনেও হরলিক্স-কমপ্লান জাতীয় মহান শক্তিদাতার খপ্পরে পড়ে মানুষ আর বহুগুণ গাঁটগচ্চা দেয়। সুস্থ শরীর ও পরিবেশ, প্রেম ও ভালবাসা, উপযুক্ত বয়স—এগুলিই যে স্বাভাবিক যৌন ক্ষমতার অধিকারী করে তোলে এই বোধ না থাকায়, অনেকেই গন্ডারের সিং-এর গুঁড়ো, বাঘের নখের মাদুলি থেকে শুরু করে স্ট্রোজেন হরমোন বা ভায়াগ্রার মত মালকড়ির খপ্পরে পড়ে।

যে খাবার ভাল লাগেনা, তা খেলে পেট হয়তো ভরে কিন্তু সত্যিকারের তৃপ্তিলাভ হয়

না। বারবার তা খেতে বাধ্য হলে একসময় খাওয়ার আগ্রহ চলে যায়, ফলে শুরু হয় শারীরিক নানা বিপত্তি। যে সঙ্গী বা সঙ্গিনীকে ভাল লাগে না, তার সঙ্গে যৌনমিলন করলে সন্তানলাভ হয়তো হয়, কিন্তু সত্যিকারের তৃপ্তিলাভ হয় না। বারবার তা করতে বাধ্য হলে এক সময় যৌন-আগ্রহই চলে যায়, ফলে শুরু হয় হতাশা সহ নানাবিধ মানসিক বিপত্তি আর তার থেকে শারীরিক নানা বৈকল্যও। প্রেমহীন যৌনতা সার্বিক বৈকল্যের জনক।

খাদ্যগ্রহণ ও যৌনক্রিয়া—উভয়ের দ্বারা আপাতভাবে ব্যক্তিবিশেষের আনন্দ লাভ হয় ও তৃপ্তি ঘটে। কিন্তু উভয়েরই রয়েছে ব্যক্তি ছাড়িয়ে সামাজিক তাৎপর্য। সুষম খাদ্য গ্রহণের মধ্য দিয়ে সুস্থ ব্যক্তি যে শক্তি ও ক্ষমতা অর্জন করে, তা সমাজে তার নির্দিষ্ট অবদান রাখার ক্ষেত্রে তাকে উপযুক্ত করে তোলে। অকালে মারা গেলে বা সমাজ-সংসার ছেড়ে নির্জন পাহাড়ে অলীক ঈশ্বরের ধ্যানে সময় নষ্ট করলে ব্যক্তিবিশেষের এই অবদান সমাজ ও সমাজের অন্য মানুষ আর পায় না। বিশেষ কারণ না থাকলে, নিজের যৌনক্ষমতার সদ্ব্যবহার না করে ব্রহ্মচর্য পালনের মতো জোর করে প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যকে অবদমিত করে রাখলে, প্রজননের দ্বারা নিজ প্রজাতির ভারসাম্য রক্ষা করার ক্ষেত্রেও ব্যক্তিবিশেষের অবদান সমাজ পায় না। অবশ্য বর্তমান বিশ্বে অতি জনসংখ্যার কারণে ছড়িয়ে-ফেলে-নষ্ট করে খাওয়া-দাওয়া করা যেমন অন্যায়, তেমনি অধিক সন্তান-সন্ততির জন্ম দেওয়ার ক্ষেত্রেও রাশ টানার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।

তবু শুধু ব্যক্তিবিশেষের কথা ধরলে খাদ্যগ্রহণ যৌনতার চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ। খাদ্য গ্রহণ না করলে বিশেষ ব্যক্তির মৃত্যু তথা অবলুপ্তি অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু যৌনক্রিয়াকলাপ না করেও স্বচ্ছন্দে বেঁচে থাকা যায়। যৌনতা প্রাকৃতিক ব্যাপার হলেও তা বিশেষ ব্যক্তির অস্তিত্বের জন্য অপরিহার্য নয়। তার প্রয়োজন একদিকে নিজের তৃপ্তি ও শারীরিক মানসিক স্বাভাবিকতা রক্ষার জন্য, অন্যদিকে নিজ প্রজাতির ধারাবাহিকতা রক্ষার স্বার্থে।

কিন্তু খাদ্যগ্রহণের মত যৌনতা নিছক ব্যক্তিকেন্দ্রিক নয়। নেহাৎ আত্মরতি বা স্বমৈথুনের মত নির্দোষ যৌনতা হলে আলাদা কথা; না হলে যৌন ক্রিয়ার জন্য অন্য সঙ্গী বা সঙ্গিনীর প্রয়োজন হয়। তাই বিশেষত পুরুষদের যৌন উচ্ছৃঙ্খলতা বা সম্মতিহীন যৌন সম্পর্ক নারীদের মন ও শরীরকে বিপর্যস্ত করে দেয়। 'ইভটিজিং' বিকৃত যৌনতার একটি মৃদুতর বহিঃপ্রকাশ। নারীদের প্রতি সম্মানের অভাব আর তাদের শুধু পুরুষের যৌনক্ষুধা মেটানোর জন্য শরীর সর্বস্ব একটি প্রাণী হিসেবে গণ্য করার মানসিকতা যে পুরুষদের মধ্যে আছে, তাদের দ্বারা এইভাবে 'ইভটিজিং' থেকে ধর্ষণ নানাবিধ যৌন কুকর্মই করা হয়। যৌনতা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্য এই ধরনের যৌনবিকৃতি প্রতিরোধ করাও বটে।

পাশাপাশি যৌনপ্রক্রিয়ার পেছনে শারীরতাত্ত্বিক যে বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া থাকে সে সম্পর্কে অজ্ঞ থাকাটা অভিপ্রেত নয়। অভিপ্রেত নয় যৌনতার মত অতি গুরুত্বপূর্ণ মানসিক ও শারীরিক বিষয়কে ঘিরে নানা ধরনের কুসংস্কার ও ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করাও। কাম্য নয় যৌনতার মত জীবনের অবিচ্ছেদ্য একটি অংশকে ঘিরে অহেতুক শুচিবাই। শোভনতার সীমা না ছাড়িয়েও সংস্কারমুক্ত যৌন আচরণ করা যায়।

আর এসব নিয়ে আরো অনেক লেখালখিও হয়েছে। সম্প্রতি এই বিষয়টি একটি নতুন মাত্রাও পেয়েছে—একদিকে পৃথিবী জুড়ে যৌনতা প্রসঙ্গে সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন, অন্যদিকে বিদ্যালয় স্তরেও যৌনশিক্ষা (জীবনশৈলী বা প্রজননবিজ্ঞান প্রশিক্ষণ) দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করার ফলে। আর এই পরিপ্রেক্ষিতেই এখনকার এই ছোট্ট বইটরি প্রচেষ্টা। যৌনতা সম্পর্কিত বৈজ্ঞানিক তথ্য সম্পর্কে কিছুটা ওয়াকিবহাল করা এবং যৌনতাকে কেন্দ্র করে কিছু কুসংস্কারকে দুর করার চেষ্টা—এসব উদ্দেশ্যেই এই দুর্বল প্রচেষ্টা। দুর্বল হলেও পাঠকপাঠিকাদের তা যদি সামান্য কিছুটাও সাহায্য করে তাহলেও এই প্রচেষ্টা সার্থক হয়। আর তাই এ ব্যাপারে পাঠক-পাঠিকাদের খোলাখুলি মতামত ও সমালোচনা কাম্য।

বইটি তৈরি করার ব্যাপারে তথ্য সংগ্রহ ও অন্যান্য সহযোগিতার জন্য আমি নানা জনের কাছেই কৃতজ্ঞ। এদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয় সুপ্রিয় দে, তাপস, কৌশিক, আরতি, সোনালী, সুপর্ণা, অনিরুদ্ধ এবং শম্ভুনাথ পন্ডিত হাসপাতালের আকুপাংচার বিভাগের সহকর্মীদের কথা। আর প্রকাশক-বন্ধু শঙ্কর তো তার খোলামন আর অকৃত্রিম উৎসাহদানের কারণে সৌজন্যমূলক কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ঊর্ধ্বে।

১ লা জানুয়ারি, ২০০৬

ডাঃ ভবানীপ্রসাদ সাহু

(১)
যৌনতা

যৌনতা শব্দটি অধিকাংশ বাংলা অভিধানে নেই। যেমন 'চলন্তিকা'তেই নেই। আছে যৌন শব্দটি, যার অর্থ বলা হয়েছে 'কাম বা স্ত্রী পুরুষের মিলন সম্বন্ধীয়' এবং 'যোনি সম্বন্ধীয়'। নারীর যোনি যেহেতু নারীপুরুষের মিলনের প্রধান অঙ্গ তাই 'যৌন' শব্দটির মধ্যে এই 'যোনি'-র প্রাধান্যও যথাসম্ভব প্রতিফলিত হয়েছে। 'যৌন' কথাটি বিশেষণ। অন্যদিকে যৌনতা বিশেষ্যপদ, যার অর্থ বলা যায় যৌন ক্রিয়াকলাপ এবং এসম্পর্কিত মানসিকতার ব্যাপারগুলিকে। ইংরেজি সেক্স (sex) ও সেক্সুয়েলিটি (sexuality)-র কাছাকাছি বাংলা প্রতিশব্দ হতে পারে এই যৌনতা কথাটি। চিকিৎসা বিজ্ঞানের অভিধানে এই সেক্সুয়েলিটি-র অর্থ বলা হয়েছে, (১) কোন ব্যক্তিবিশেষের যৌন আচরণ ও ইচ্ছার সামগ্রিকতা এবং এই ইচ্ছার ক্ষমতা; (২) কোন ব্যক্তিবিশেষের যৌন আকর্ষণীক্ষমতার মাত্রা;(৩) যৌন কাজকর্ম বা তার পরিণামের চরিত্র। সেক্সুয়ালিটির-র মত ইংরেজি 'সেক্স' (Sex) শব্দটিও বিশেষ্য। এই সেক্স কথাটির অর্থ বলা হয়েছে, (১) বিশেষ ব্যক্তির অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক যৌনাঙ্গ, ক্রোমোজোম ও হরমোনের গুণাবলী—এসবের বিশ্লেষণ করে, স্ত্রী বা পুরুষ হিসেবে আলাদা ভাবে চিহ্নিত করার জৈব গুণ বা চরিত্র;(২) কোন ব্যক্তিবিশেষের শরীর বৃত্তীয় ও মানসিক যে-গঠন প্রক্রিয়ার ফলে বংশবৃদ্ধি করার বা যৌনাঙ্গ সম্পর্কিত আনন্দ পাওয়ার মানসিকতা গড়ে ওঠে। আর বিশেষণ হিসেবে সেক্সুয়েল (sexual) বা যৌন কথাটির অর্থ বলা হয়েছে যৌন উত্তেজনা, অন্যের যৌন উত্তেজনায় সাড়া দেওয়া ও যৌনাঙ্গের কাজকর্ম সহ সেক্স বা যৌনতা সম্পর্কিত।

সব মিলিয়ে যৌনতার ব্যাপারটির মধ্যে শুধু যৌন ক্ষমতা, ক্রিয়াকলাপ বা মানসিকতার ব্যাপারটি বোঝায় না। এর তাৎপর্য অনেক বেশি ব্যাপক। একটি সুস্থ শিশু যখন জন্মায় তখনি সে ছেলে বা মেয়ের শারীরিক বৈশিষ্ট্য নিয়েই জন্মায়। অর্থাৎ তখনি তার 'সেক্স' নির্ধারণ হয়ে যায়। কিন্তু তখন তার মধ্যে সামান্যতম যৌন আবেগ বা ক্রিয়াকলাপের প্রতি আগ্রহ থাকে না। সদ্যোজাত শিশুর ঐ যৌনতা নিতান্তই প্রাথমিক স্তরের। এরপর শিশুটি যতই বড় হতে থাকে, ততই তার মধ্যে ধীরে ধীরে এ সম্পর্কে কিছু কিছু ধারণার সৃষ্টি হয়, যৌনাঙ্গ সম্পর্কিত আনন্দ পাওয়ার ব্যাপারটি জাগতে থাকে। শৈশবাবস্থায় ভিন্ন লিঙ্গের সঙ্গে যৌন মিলনের জন্য আগ্রহ না থাকলেও, ভিন্ন লিঙ্গের বিভিন্ন বয়সের ব্যক্তির প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হতে থাকে। যৌনাঙ্গ থেকে এক ভিন্ন ধরনের 'নিষিদ্ধ' আনন্দ

পাওয়ার ব্যাপারটাও শুরু হয়। এর পর শুরু হয় কৈশোর, যখন ছেলেদের শুক্রাশয় (testis) শুক্রকোষ সৃষ্টি করতে শুরু করে ; মেয়েদের ডিম্বাশয় (ovary) থেকে ডিম্বকোষও নির্গত হতে থাকে— মাসিক ঋতুস্রাব শুরু হয়, স্তনের বৃদ্ধি ঘটতে থাকে। সব কিছুই ঘটে অগ্ন্যুৎপাতের মত বিভিন্ন হরমোনের প্রবল নিঃসরণের ফলে, যা কিশোর-কিশোরীর শরীরে অসাধারণ প্রাকৃতিক গুণগত পরিবর্তন ঘটাতে থাকে। শরীর-মন উভয়েরই যৌন বিকাশ দ্রুত ঘটতে থাকে। কিশোর হয়ে উঠতে থাকে এক পুরুষ যে নারীর সঙ্গে যৌন মিলনে প্রজাতির ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে পারে। কিশোরী হয়ে উঠতে থাকে নারী, যে পুরুষের সঙ্গে যৌনমিলনে সন্তানের জন্ম দিতে পারবে।

মূলত নিতান্তই স্থূল এই জৈব প্রাকৃতিক প্রয়োজনেই এই শারীরিক বিকাশ, শরীর ও মন দিয়ে ভিন্ন লিঙ্গের সঙ্গে মিলিত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা। লক্ষ লক্ষ বছর আগে প্রাকৃতিক বিবর্তনের ফলে যখন উভলিঙ্গ প্রাণীর সৃষ্টি হয়, সৃষ্টি হয় মানুষ তথা নারী-পুরুষ তখন এখনকার মত এই সমাজ-সভ্যতা ছিল না, ছিল না শিক্ষা-দীক্ষা-সামাজিক মূল্যবোধ কিংবা পেশাগত প্রতিযোগিতা, জীবনে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ঘোড়দৌড়। আদিম ঐ সময়ে প্রাণধারণের জন্য খাদ্য সংগ্রহ আর যৌন আনন্দ লাভ করা তথা বংশবৃদ্ধি ঘটানোর জন্য যৌনমিলন— এই ছিল প্রাথমিক জৈবিক প্রয়োজন। তখন অবাধ যৌনমিলনে অপরাধবোধও যেমন ছিল না, তেমনি ছিল মাত্রা ছাড়া জন্মহার ও স্বাভাবিকভাবেই হয়তো শিশুমৃত্যুহার ও নারী-শিশুর অন্যান্য জটিলতাও। তখন ব্যক্তিগত সম্পত্তি ছিল না, সম্পত্তির উত্তরাধিকার নির্ণয়ে সন্তানের পিতৃত্বের সুনির্দিষ্টকরণের প্রয়োজনীয়তাও ছিল না। স্বাভাবিকভাবেই ছিল না বিবাহ প্রথা ও আনুষঙ্গিক বিধি-নিষেধ।

এইভাবে চলেছে হাজার হাজার বছর। কিন্তু একসময় মানুষের জ্ঞান ও দক্ষতা বেড়েছে। প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই করতে করতে আর চারপাশের ঘটনাবলী পর্যবেক্ষণ করতে করতে এবং পাশাপাশি মানুষের মস্তিষ্কের ক্ষমতা তথা কল্পনা করা ও সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে মানুষ একের পর এক যুগান্তকারী আবিষ্কার করেছে।

কৃষিকাজ, পশুপালন ও অন্যান্য উৎপাদন প্রক্রিয়া সে করায়ত্ত করেছে। একদিকে মানুষ কল্পনা করেছে অতিপ্রাকৃতিক অলৌকিক এক শক্তির, যা সব কিছুর নিয়ন্তা—পরবর্তী কালে এই কল্পনা রূপ পেয়েছে ঈশ্বর, ভগবান, আল্লা, গড ইত্যাদি নামের নানা ধারণায়; অন্যদিকে সৃষ্টি হয়েছে উদ্বৃত্ত সম্পদ ও ব্যক্তিগত সম্পত্তি। সামাজিক-অর্থনৈতিক-সাংস্কৃতিক এই ধরনের বিকাশের সঙ্গে বিবর্তিত ও পরিবর্তিত হয়েছে যৌনতা ও যৌন আচরণ সম্পর্কিত মানুষের ধ্যানধারণা এবং ক্রিয়াকর্মও।

(২)

যৌনতা, প্রেম ও বিবাহ

ক্ষুধাতৃষ্ণার মত যৌনতা-ও নর-নারীর একটি স্বাভাবিক প্রাকৃতিক চাহিদা ও প্রয়োজন। কিন্তু বিশেষত মানুষের ক্ষেত্রে এই যৌনতা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সম্পূর্ণ শরীর নির্ভর নয়। সেখানে তার মন-এরও একটি ভূমিকা রয়েছে। মন তথা ব্যক্তি বিশেষের রুচি-চিন্তা-ভাবনা এবং শরীর তথা যৌনতা—উভয়ের জটিল সংমিশ্রণে যে অসাধারণ ব্যাপারটি নর-নারীর ক্ষেত্রে ঘটে, তাকে সাধারণভাবে প্রেম, ভালবাসা তথা ভাললাগা ইত্যাদি নামে অভিহিত করা হয়। অন্যদিকে শরীর সর্বস্ব যৌনতার লাগাম টেনে ধরতে ঐতিহাসিকভাবে বিবাহ নামক একটি কৃত্রিম প্রক্রিয়ার জন্ম দিয়েছে মানুষ, যার মধ্যে শুধু এই লাগাম টানা নয়,—উত্তরাধিকারী নির্ধারণ করা থেকে বিশেষত নারীর উপর পুরুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা এসব বিষয়ও জড়িয়ে আছে। সৃষ্টি হয়েছে পরিবার প্রথা এবং এই পরিবারকে কেন্দ্র করে সামাজিক অনুশাসন, বিশেষ ধরনের মূল্যবোধ ও তথাকথিত নৈতিকতা। দীর্ঘদিনের সামাজিক ও মানসিক অভ্যাসের ফলে বিবাহিত নারী-পুরুষের সম্পর্ক ও পরিবারকে নিজেদের যৌনপ্রয়োজনেরও উপরে স্থান দেওয়া হয়েছে এবং এটিকেই আদর্শ, অবশ্যম্ভাবী, অলঙ্ঘনীয় হিসেবে ভাবা হয়েছে। এর ফলে একদিকে সামাজিক শৃঙ্খলা, নারী-শিশুদের নিরাপত্তা—এগুলি যেমন কিছুটা রক্ষিত হয়, অন্যদিকে যৌনঅতৃপ্ত নারী-পুরুষের মানসিক-শারীরিক জটিলতা ও প্রেমহীন সম্পর্কের বেড়াজালে আটকে রাখার ফলে যৌনবিকৃতি ও উচ্ছৃঙ্খলতার মত নানাবিধ সামাজিক বিপদও ঘটে। বিবাহ প্রথা ও এসম্পর্কিত কঠোর অনুশাসনের ফলে নিজের শরীর ও মনের উপর ব্যক্তিবিশেষের অধিকার তথা ব্যক্তি স্বাধীনতাও বিঘ্নিত হয়।

বিবাহের পরিবর্তে অবাধ যৌনতা থেকে শুরু করে বিবাহ-বন্ধনহীন 'লিভ টুগেদার' এর কথাও অনেকে বলেন। মন নামক মানুষ ও মানুষীর অসাধারণ জিনিষটি গড়ে ওঠে তার সমাজ, আদর্শবোধ, সংস্কৃতি, বিশ্বাস তথা ভালোলাগা-খারাপলাগা ইত্যাদি নানাকিছুর উপর ভিত্তি করে। এই মন-হীন শরীর-সর্বস্ব অবাধ যৌনতাকে তাই ঠিক মানবিক হিসেবে গণ্য করা দুরূহ। সেটি সুস্থ সুন্দর কোন ব্যাপারও হতে পারে না। তা একধরনের অসুস্থতা ও বিকৃতিরই নামান্তর। এই বিকৃতিরই বশে বিশেষত পুরুষদের দ্বারা নারীরা লাঞ্ছিতা হয়, ধর্ষিতা হয়। ধর্মীয় দাঙ্গার সময় এক ধর্মের পুরুষ অন্য ধর্মাবলম্বী কিশোরী বা যুবতীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে যখন তাকে ধর্ষণ করে, তখন তার মধ্যে ঐ নিরপরাধ নিষ্কাম নারীর

প্রতি ভালোবাসার সামান্যতম থাকে না, মেয়েটির মধ্যে তো থাকেই না। পুরুষটি তখন ভিন্ন ধর্মীয় নারীর এই যৌন-অবমাননার মধ্যে ভিন্ন ধর্মের প্রতি যুক্তিহীন মিথ্যা আক্রোশ আর ঘৃণারই বহিঃপ্রকাশ ঘটায়। এই পুরুষ পশুরও অধম। কোন পুরুষ পশুও কখনো এই ধরনের ঘৃণা বা আক্রোশের বশে যৌনমিলন করে না, স্ত্রী-পশুর যৌন লাঞ্ছনা ঘটায় না। একদিকে নারীদের শুধু ভোগের সামগ্রী হিসেবে গণ্য করা, অন্যদিকে কোন পরিবার বা গোষ্ঠীর পবিত্রতা, শুদ্ধতা বা নিজস্ব সংস্কৃতির প্রতীক হিসেবে নারীদের গণ্য করা—এই উভয় ধরনের মানসিকতা থেকে এই ধরনের দাঙ্গাবাজ নরপশুরা ভিন্ন ধর্মীয় নারীর চরম অবমাননা করে। এরা আসলে ভিন্নধর্মীয় বলে নয়, নিজ ধর্মের নারীদেরও ভোগ্যপণ্য হিসেবে মনে করে, নিজধর্মের নারীদেরও সম্মান করে না, ভালোবাসে না।

যৌন স্বাধীনতা বা তথাকথিত যৌনমুক্তির মধ্যে যৌনতা ও যৌনসম্পর্ক সম্পর্কিত পূর্ব আরোপিত কোন সামাজিক অনুশাসন, সংস্কার নিয়ম-কানুন ব্যতিরেকেই যৌন সম্পর্ক স্থাপনের আদর্শকে তুলে ধরা হয়। কিন্তু ব্যাপারটি ধর্ষণ নয়। সংশ্লিষ্ট নারী পুরুষের পারস্পরিক সম্মতি ও ভালো লাগার উপর ভিত্তি করেই ঐ সম্পর্ক স্থাপিত হয়। এই ভালোলাগা বা ভালোবাসার ব্যাপারটি শেষ হয়ে গেলে ঐ সম্পর্কও ভেঙ্গে যায়। নারী-পুরুষ উভয়ের সত্যিকারের সমানাধিকার ও স্বাধীনতার সঙ্গে এটি সম্পৃক্তভাবে সম্পর্কিত।

যাদের মনে ভালোবাসা আছে তারা ভালোবাসবেই। একাধিক জনকেও। সেটি ভালোবাসারই বহিঃপ্রকাশ,—শরীর সর্বস্ব অবাধ বা উচ্ছৃঙ্খল যৌনতা নয়। বিশেষ ঐ নারী বা পুরুষই নিজের কাছে সৎ থাকবেন, যদি তিনি এ ব্যাপারে নিজে অন্তত নিশ্চিত থাকেন যে, সাময়িক শারীরিক ফূর্তির জন্য নয়, মনের মিল আর ভালোবাসাই মন ছাড়িয়ে শরীরে শরীরে দীর্ঘস্থায়ী ভালবাসার সম্পর্ক গড়ে তুলেছে। এই শারীরিক সম্পর্কের ভিত্তি হিসেবে যদি সত্যিই চিন্তাভাবনা, মানসিকতা, মূল্যবোধ, আদর্শ ও পারস্পরিক সহমর্মিতার বিষয়টি প্রধান হয়ে থাকে, তবে তার মধ্যে কলুষতা ও সামাজিক বিধিনিষেধের কালো হাত তথা আইনী সম্পর্কের বেড়াজালের আমদানি করা ভালোবাসার মত একটি নির্মল মানবিক গুণের উপর কালিমা লেপন ছাড়া কিছুই নয়।

অন্যদিকে আইনী বৈবাহিক সম্পর্ক থাকুক বা না থাকুক, একাধিক জনকে ভালোবাসার ব্যাপারটা সংখ্যার দিক থেকে যখন 'বহু'-তে দাঁড়িয়ে যায়, তখন তার মধ্যে ভালোবাসার চেয়ে বিকৃতি বা অসুস্থতার অস্তিত্ব সন্দেহ করতে হয়। কেউ যদি কিছুদিন অন্তর অন্তরই এক একজন নারী বা পুরুষকে 'ভালবাসতে' থাকে এবং এই 'ভালবাসার' তাগিদে যৌন সম্পর্কও স্থাপন করে, তবে ব্যাপারটিকে প্রেম বা ভালবাসার চেয়ে যৌন ক্ষুধার একটি বিকৃত বহিঃপ্রকাশ হিসেবেই গণ্য করা যায়। প্রকৃত ভালবাসার সম্পর্ক সাময়িক নয়, প্রকৃত ভালবাসাও ক্ষণস্থায়ি হতে পারে না। কোন শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন না করেও কোন নারী বা পুরুষ কোন পুরুষ বা নারীকে আজীবন ভালবাসতে পারে, এমনকি তা একতরফাও হতে পারে, যদিও আপাতত তার বাস্তব কোন সার্থকতা নেই। অন্যদিকে শরীর-মন একাকার

হয়ে যে ভালবাসা তা শুধু বিশেষ নারী-পুরুষের শারীরিক-মানসিক তৃপ্তি ও সুস্থতার সহায়ক নয়, তার জীবন, চেতনা ও সৃষ্টিশীলতার পূর্ণতা অর্জনেরও সহায়ক হতে পারে। এ প্রসঙ্গে রবিশঙ্করের জীবনের একটি পর্যায়ের সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে তাঁর পূর্বতন স্ত্রী অন্নপূর্ণার জীবনী লেখক স্বপন কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছিলেন,—

"ওদিকে রবিশঙ্কর জানলার বাইরে আকাশ দেখছিলেন আর ভাবছিলেন, কেন এরা মানতে পারে না যে একই সঙ্গে একের বেশি নারীকে ভালবাসা যায়, যায়, যায়। এটা তিনি নিজের জীবন দিয়ে জেনেছেন—ভালবাসা বিভিন্ন রকমের হয় এবং তার পাত্র বিচারে তফাতও থাকে। স্ত্রীর প্রতি ভালবাসা, বন্ধুর প্রতি ভালবাসা, অন্য কোন নারী বা প্রেমিকার প্রতি ভালবাসা এগুলো সবই একে অন্যের পরিপূরক। মানুষের হৃদয় চায় পরিপূর্ণতা। আর সেই পরিপূর্ণতার পথে যদি একের বেশি নারীর সঙ্গে সম্পর্ক থাকে, যদি ভালবাসায় মন উথাল পাতাল হয়, তবে সেই দ্বিতীয় নারীকে ভালবাসতে দোষ কোথায়? প্রেম, ভালবাসা, সহানুভূতি, এই সব বিলিয়ে দিলেই তো এদের সার্থকতা। এসব কেন অন্নপূর্ণা বোঝে না? অন্নপূর্ণা নিজে শিল্পী, তাঁর হৃদয় বিরাট, কিন্তু এই দুর্বলতাটুকু কেন সে মেনে নিতে পারে না?"

সমাজ স্বীকৃত বৈবাহিক সম্পর্কের গন্ডি ছাড়িয়ে রবিশঙ্করের এই ভাবনার তাৎপর্য প্রচলিত মধ্যবিত্তসুলভ মূল্যবোধের দ্বারা আচ্ছন্ন থেকে অনুভব করা সাধারণভাবে মুস্কিলই হতে পারে। কিন্তু একটু তলিয়ে ভাবলেই এর মধ্যে ভালবাসার অনিবার্যতা ও অলঙ্ঘনীয় পরিণতির দিকটি বোঝা যায়। পুরুষ বা নারী সবাই ক্ষেত্রেই তা সত্যি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও বহু নারীর সংস্পর্শে এসেছেন। অসমবয়সী রানু সর্বাধিকারীকে বিয়ের কথাও বলেছিলেন, যা সদ্যতরুণী রানু আন্তরিকভাবে গ্রহণও করেছিলেন।

আসলে বিবাহ ব্যাপারটিই একটি কৃত্রিম মনুষ্যসৃষ্ট প্রক্রিয়া। সামাজিক শৃঙ্খলার জন্য উদ্দাম যৌনতা নিয়ন্ত্রণ করতে এবং সর্বোপরি ব্যক্তিগত সম্পত্তির সঠিক উত্তরাধিকারী নির্ণয়ের জন্য তথাকথিত এই 'বিবাহ' নামক ঘটনা ঘটানো হয়েছে। বিবাহ কথাটির অর্থ বিশেষভাবে বহন করা। অর্থাৎ যেন একজন পুরুষ একজন মহিলাকে বাকি জীবন বহন করার প্রতিশ্রুতি দেওয়ার যে সমাজ স্বীকৃতি পদ্ধতি সেটিই হল বিবাহ। এর মধ্য দিয়ে একজন পুরুষকে ভারবাহী প্রাণী ও একজন নারীকে পরনির্ভর প্রাণীতে যেন পরিণত করা হচ্ছে। শেলি (Shelley) যেমন বলেছিলেন, "A system could not well have been devised more studiously hostile to human happiness than marriage". মোটামুটি যার ভাবার্থ হচ্ছে—মানুষের আনন্দের অন্তরায় হিসেবে বিবাহের চেয়ে অন্য কোন পদ্ধতি মনে হয় আর তৈরি করা যেত না।

বিবাহ প্রক্রিয়ার মাধুর্য ও বন্ধনের সঙ্গে, বিশেষ ব্যক্তির স্বাধীনতা ও সার্বিক আনন্দের এই দ্বন্দ্ব চিরকালই আছে। এক একজনের ক্ষেত্রে বিশেষ একদিকে পাল্লা ভারি হয়। তাই কেউ বিবাহ-কে জীবনের ধ্রুব, অপরিবর্তনীয় একটি পদ্ধতি হিসেবে গ্রহণ করে প্রচলিত

সামাজিক প্রক্রিয়ায় সংসার জীবন যাপন করেন। আবার কেউ বিবাহকে ভালবাসার একটি ধাপ হিসেবে গ্রহণ করে, ভালবাসার ভিন্নতর মানুষকে অবলীলায় গ্রহণ করেন; সেক্ষেত্রে তাঁকে প্রচলিত সামাজিক অনুশাসনকে অস্বীকার করতে হয় ও একমাত্রিক সংসারকে ভাঙতে হয়। আর এক্ষেত্রেই গেল গেল রব ওঠে।

বিশেষ ধর্মীয় অনুশাসন ও আইনের মধ্যেও বিবাহকে একটি বিশেষ বন্ধন হিসেবে গ্রহণ করা হয়। মুসলিম আইন ছাড়া অন্য কোন আইনেই এক স্ত্রী বা স্বামী থাকতে অন্য স্ত্রী বা স্বামীকে আইনত গ্রহণ করার কথা বলা হয় না। বিশেষ কিছু আদিবাসি গোষ্ঠীর মধ্যে তথাকথিত এইসব আইনকানুন নেই। কিছু কিছু গোষ্ঠীর মধ্যে এখনো মাতৃতান্ত্রিক সমাজের অবশেষ টিকে আছে। খাসিয়াদের মধ্যে যেমন এক নারী একাধিক পুরুষকে স্বামী হিসেবে গ্রহণ করেন, মূলত তা সম্পত্তি সুরক্ষার জন্য। আফ্রিকার জুলুদের মধ্যে কোন পুরুষের একাধিক স্ত্রী না থাকলে তা তার অপদার্থতা হিসেবে গণ্য করা হয়। একাধিক পত্নীর স্বামীকে সম্মানজনক উপাধি দেওয়া হয় আইসোকা (isoka) নামে। মুসলিম আইনে সব স্ত্রী-কে সমানভাবে দেখার নির্দেশ দিয়ে (বাস্তবত তা যতই অসম্ভব হোক না কেন) একজন পুরুষকে একই সঙ্গে চারজন স্ত্রী রাখার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এ ক্ষেত্রেও বৈষম্য স্পষ্ট। একজন মুসলিম পুরুষকে এই অনুমতি দেওয়া হলেও, একজন মুসলিম নারীকে এই অধিকার দেওয়া হয় নি। একজন মুসলিম নারী একই সঙ্গে একাধিক স্বামী-র স্ত্রী হতে পারেন না। এখন থেকে প্রায় দেড় হাজার বছর আগে, হযরত মহম্মদ যে সময়ে এই ধরনের অনুশাসন প্রবর্তন করেছিলেন, তখন তার মধ্যে ঐ সময় পুরুষের দ্বারা চূড়ান্ত নারী নিগ্রহ বন্ধ করার মানবিক একটি প্রচেষ্টা ছিল। কিন্তু এখনো তাকে অন্ধভাবে আঁকড়ে রাখাটা যুক্তিযুক্ত কিনা তা নিয়ে বিতর্কের অবকাশ আছে।

কিন্তু আইন যাই হোক না কেন, কোন ক্ষেত্রেই মানুষের মনকে, তার ভাললাগা ও ভালবাসার ক্ষেত্রকে এবং তার যৌন আবেগ ও চাহিদাকে সম্পূর্ণভাবে শৃঙ্খলিত করা সম্ভব নয়। তাই মাঝে মাঝেই ঘটে ধর্মীয় অনুশাসন ও প্রচলিত আইন ভাঙার ঘটনা, অথবা সঙ্কোচ মুক্ত, মুক্তমনে তা গ্রহণ না পেরে মানসিক ও শারীরিক যন্ত্রণা ভোগ, নানা ধরনের অসুস্থতা, এমনকি আত্মহননও।

অথচ এ ব্যাপারে নারী-পুরুষ উভয়েরই মুক্ত দৃষ্টিভঙ্গী থাকলে ছবিটি অনেক পাল্টাতে পারে। তথাকথিত দাম্পত্য সম্পর্কের যান্ত্রিক শৃঙ্খলা যদি শৃঙ্খলে রূপান্তরিত হয় তবে তা সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গীরই জন্ম দেবে, চিন্তার মুক্তি তার থেকে ঘটা সম্ভব নয়। Family এসেছে famulus কথাটি থেকে যার অন্তর্নিহিত অর্থ এক প্রভুর অধীনে একাধিক দাস। শ্রেণীবিভক্ত সমাজের অনিবার্য পরিণতি এই পারিবারিক প্রথা,—যেখানে পুরুষের আধিপত্যে নারী ও সন্তানেরা যূথবদ্ধ থাকে। দীর্ঘদিনের সামাজিক ও মানসিক অভ্যাসে এই ধরনের পরিবার প্রথা তথা পুরুষ আধিপত্যের বিষয়টি স্বাভাবিক একটি ব্যাপার বলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। শ্রেণীবিভক্ত সমাজ ও ব্যক্তিগত সম্পত্তির অনিবার্য উপস্থিতির কারণে

এবং তাদের প্রয়োজনে এই পরিবার প্রথা ও পুরুষ আধিপত্যকে মহীয়ান করার কাজও অব্যাহত আছে। ধর্মপুস্তক থেকে সাহিত্য-চলচ্চিত্র—প্রায় সর্বত্রই এই কাজ করা হয়। তার থেকে ব্যত্যয় ও বিচ্যুতি ঘটলে ওঠে 'গেল গেল' রব। রাষ্ট্রের আইন কানুন তৈরি করে প্রয়োজনে শাস্তির বিধান দেওয়া হয়, যাতে কেউ ঐ বিচ্যুতি না ঘটায়। অবশ্যই বিশেষ কিছু ক্ষেত্রে এই ধরনের আইন ও শাস্তির প্রয়োজন রয়েছে, যেমন বিয়ের নাম করে অসহায় কোন মহিলাকে প্রতারণা করা, তার নিরাপত্তা ও সুস্থিতির দায়িত্ব আদৌ না গ্রহণ করা ইত্যাদি ক্ষেত্রে; কারণ বর্তমান সময়ে ও সমাজে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ও উপার্জনের ব্যাপারে মহিলারা পুরুষদের তুলনায় অনেক অনেক পিছিয়ে। যেখানে নারী-পুরুষ উভয়ের অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠা, স্বাচ্ছন্দ্য ও স্বাধীনতার ক্ষেত্রে কোন ঘাটতি নেই, সেক্ষেত্রে নারী-পুরুষের তথাকথিত বৈবাহিক সম্পর্কের মধ্যে অন্যজনের উপস্থিতি যদি নিছক লাম্পট্য বা প্রতারণামূলক না হয়, তবে সেক্ষেত্রে আইনের স্থূল হস্তক্ষেপ অবাঞ্ছনীয়। সংশ্লিষ্ট জনেরাই খোলামনে তা গ্রহণ করে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারেন।

(৩)

প্রজননের প্রয়োজনে যৌনতা

যৌনতা কোন মানুষের স্বাভাবিক প্রয়োজন হলেও, খাদ্যের মত প্রাথমিক প্রয়োজন নয়। কিন্তু মানবজাতিকে টিকিয়ে রাখার প্রশ্নে প্রাকৃতিকভাবেই মানুষ তথা অন্যান্য প্রাণীর প্রাথমিক প্রয়োজন হচ্ছে প্রজনন,—যাতে ঐ বিশেষ প্রজাতি পৃথিবীতে টিকে থাকতে পারে। এই প্রজননের প্রয়োজনেই যৌনতা—যার ফলে নারী-পুরুষ একটি বিশেষ বয়সের পর পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করে, যৌনমিলনে রত হয় এবং সন্তানের জন্ম দেয়। অন্যান্য প্রাণীদের ক্ষেত্রেও তাই। কিন্তু এখন মানুষের কাছে এই প্রজননের পাশাপাশি বা তার চেয়েও যৌনতা তথা যৌন আনন্দ ও তৃপ্তির ব্যাপারটি বেশি গুরুত্ব পেয়েছে। প্রাকৃতিক বিবর্তনের শুরুর দিকে এবং পৃথিবীতে প্রকৃতির বিরুদ্ধে লড়াই করে অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার ঐ দীর্ঘ সময়ে প্রজনন ছিল গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তখন বেশি সংখ্যায় সন্তানের জন্ম দেওয়াটা ছিল মানবপ্রজাতির অন্যতম প্রয়োজন। কিন্তু বর্তমানে এই প্রয়োজন অনেকটাই কমে গেছে। একদিকে ঘটছে জনসংখ্যার বিস্ফোরণ, অন্যদিকে মানুষের কাজ করছে যন্ত্র। মূলত এ কারণে খাদ্য-বস্ত্র-বাসস্থানের সঙ্কটের পাশাপাশি, উৎপাদনের জন্য কম লোকবলেরও প্রয়োজন হচ্ছে। ফলে অধিক সন্তানের জন্ম দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা কমে গেছে। পাশাপাশি মানুষও তার উন্নত মস্তিষ্কের ক্ষমতায় প্রজননের হাতিয়ার যৌনতাকে নিজের আনন্দ পাওয়ার মাধ্যমে পরিণত করেছে। নিয়ন্ত্রিত ও পরিকল্পিত প্রজননের পাশাপাশি দীর্ঘদিন ধরে যৌন আনন্দ উপভোগ করার মানসিকতা মানুষ অর্জন করেছে, উপায়ও আবিষ্কার করেছে।

একইভাবে পৃথিবীতে টিকে থাকার অন্যতম প্রধান শর্ত হচ্ছে শরীরে উপযুক্ত শক্তি (ক্যালরি), পুষ্টি ও জলের যোগান দেওয়া। এর প্রয়োজনে ক্ষুধা ও তৃষ্ণার মত অনুভূতি শারীরবৃত্তীয় ভাবেই সৃষ্টি হয়েছে, প্রজননের জন্য যৌন অনুভূতির মত। অন্যান্য প্রাণী এই ক্ষুধা ও তৃষ্ণা মেটানোর জন্য প্রয়োজনমত ঘাস-পাতা থেকে কাঁচা মাংস—এসব পেয়েই সন্তুষ্ট। প্রাকৃতিকভাবে লভ্য খাদ্যদ্রব্যকে তারা রূপান্তরিত বা পরিবর্তিত করে না। গরুর কাছে ঘাসের বড়া বা বাঘের কাছে মাংসের শিককাবারের কোন প্রয়োজন নেই। কিন্তু মানুষের তুষ্টি ও তৃপ্তি নিছক শাকসব্জি আর মাছ মাংসে আবদ্ধ থাকে নি। নিছক ক্যালরির যোগান দেওয়া নয়, রসনা ও শরীরের তৃপ্তির জন্য কত বিচিত্র রকমের খাদ্য ও পানীয় সে আবিষ্কার করেছে এবং এখনো করে চলেছে। পৃথিবী জুড়ে প্রচলিত

এত অসংখ্য সব খাদ্য ও পানীয় মানুষের শরীরে যোগান দেয় মাত্র ঐ ছয়টি প্রাথমিক উপাদানগুলিই,—প্রোটিন, ফ্যাট, কার্বোহাইড্রেট, ভিটামিন, লবণ জল। কিন্তু এগুলি মানুষ স্থূলভাবে গ্রহণ করে না। খাদ্য ও পানীয়ের যোগানের মধ্যেও সে আরোপ করেছে শিল্প ও সূক্ষ্ম অনুভূতি তার নিজস্ব তৃপ্তি, রুচি ও আনন্দকে পরিপূর্ণতা দেওয়ার জন্য। একই ব্যাপার ঘটেছে প্রজননের প্রয়োজন ছাপিয়ে তার যৌনতার মধ্যেও। আর এখানেই মানুষ ও মনুষ্যেতর প্রাণীদের মধ্যে গুণগত পার্থক্য।

কিন্তু মাত্রা ছাড়া ভাবে তা করতে গিয়ে এবং লাগামহীন স্থূল আনন্দের জন্য অনেক সময়ই মানুষ আত্মঘাতী বা ক্ষতিকর নানা প্রক্রিয়ার জালে নিজেদের আটকে ফেলছে। খাদ্যের ক্ষেত্রে প্রয়োজন ছাড়িয়ে তথাকথিত ফাস্টফুডের উপর অতিনির্ভরতা, পানীয়ের ক্ষেত্রে মদ্যপান বা যৌনতার জন্য ব্লুফিল্ম আর অনিয়ন্ত্রিত সমকামিতা-বহুগামিতা—এগুলি এই ধরনের নানা প্রক্রিয়ার ছোট্ট ও সাধারণ উদাহরণ। ফাস্টফুডের মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহার সৃষ্টি করছে স্থূলতা, হৃদরোগ, অকালমৃত্যু। নিয়ন্ত্রণহীন মদ্যপান ডেকে আনছে শারীরিক-মানসিক-পারিবারিক-সামাজিক বিপর্যয়। অনিয়ন্ত্রিত সমকামিতা, বহুগামিতা প্রসার ঘটাচ্ছে এইডস-এর মত মারণ রোগের এবং সঙ্গে ব্লুফিল্মের অবাধ প্রদর্শন বিপর্যস্ত করছে সৃজনশীলতা, সুস্থ মূল্যবোধ ও মনন এবং সমাজে নারীর সুস্থ অবস্থানকেও। আর এখানেও মানুষ ও মনুষ্যেতর প্রাণীদের মধ্যে রয়েছে গুণগত পার্থক্য।

তবু প্রাথমিকভাবে নর-নারীর শারীরিক বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে সার্থকভাবে সন্তানের জন্ম দেওয়া। মানুষ ও মানুষীর মানসিক আবেগ (যা আসলে হরমোন ও মস্তিষ্ক তথা নার্ভতন্ত্র নির্ভর) ও শরীরের বিশেষ অঙ্গগুলি এই লক্ষ্যেই বিবর্তিত হয়ে বিকশিত হয়েছে—যার সামগ্রিক বহিঃপ্রকাশ ঘটে যৌনতার মধ্যে।

তাই যৌনতাকে একটি অন্যায় বা অপরাধমূলক ক্রিয়া হিসেবে মনে করা কিংবা যৌনতাকে ঘিরে সংকীর্ণ সংস্কারাচ্ছন্ন দৃষ্টিভঙ্গি প্রকৃতির স্বাভাবিক প্রবণতা বিরোধী মানসিকতারই ফসল। পুরুষ বা নারী যার ক্ষেত্রেই হোক না কেন, নিয়ন্ত্রিত আত্মমৈথুন (বা হস্তমৈথুন) এবং পারস্পরিক সম্মতি সাপেক্ষে প্রাপ্ত বয়স্কদের সমকামিতা বা নারী-পুরুষের যৌন মিলন সুস্থ স্বাভাবিক একটি প্রক্রিয়াই। এক্ষেত্রে রাষ্ট্র বা সমাজের কৃত্রিম আইন-কানুন, আরোপিত তথাকথিত কিছু অনুশাসন বা মূল্যবোধ প্রাথমিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ নয়।

(৪)

প্রজননের প্রত্যঙ্গগুলি

সুস্থ স্বাভাবিক নারী-পুরুষের বহির্যৌনাঙ্গ ও অন্তর্যৌনাঙ্গগুলি থেকে তাদের তফাৎ বোঝা যায়—জন্ম থেকেই একজনকে মেয়ে, আরেকজনকে ছেলে বলে চিহ্নিত করা যায়। কিন্তু শুরুতেই এটি জেনে রাখা ভাল যে, শতকরা ১০০ ভাগ নারী বা শতকরা ১০০ ভাগ পুরুষ হয় না। প্রতিটি নারী-পুরুষই প্রাথমিকভাবে উভলিংগী, পুরুষের ক্ষেত্রে পুরুষালি লক্ষণগুলি বা নারীর ক্ষেত্রে নারী-সুলভ বৈশিষ্ট্যগুলি প্রকট থাকে মাত্র। কিন্তু পুরুষের মধ্যেও নারীত্ব ও নারীর মধ্যেও পুরুষত্ব সামান্য পরিমাণে হলেও থাকে। উভয়ের শরীরেই দু' ধরনের হরমোন থাকে। উভয়ের প্রস্রাবেই পুং হরমোন ও স্ত্রী হরমোন উপস্থিত থাকে, কিন্তু তাদের পরিমাণ থাকে ভিন্ন, এবং এটিও সর্বাংশে সত্য যে নারী বা পুরুষের মানসিক গঠনের পেছনে এই দু'ধরনের হরমোনের প্রভাবই থাকে, এমনকি উভয়ের যৌন ক্রিয়াকর্মের মধ্যেও উভয়ের এই প্রভাব বর্তমান। একজন নারীর বা পুরুষের শারীরিক-মানসিক সক্রিয়তা গড়ে ওঠে স্ত্রী হরমোন ও পুং হরমোনের যুগ্ম প্রভাবে বা বলা ভাল উভয় হরমোনের তুলনামূলক স্বাভাবিক মাত্রায়। পুরুষের ক্ষেত্রে পুং হরমোনের দিকে পাল্লাটা থাকে ভারি, নারীদের ক্ষেত্রে উল্টোটা।

বাবা-মায়ের যৌনমিলনের পর বাবার পুংজননকোষ বা শুক্রাণু-র (Spermatozoa) সঙ্গে মায়ের স্ত্রী জনন কোষ ডিম্বাণু (Ovum)-এর সংযুক্তির মুহূর্তেই শিশুর লিঙ্গ নির্ধারণ হয়ে যায়। এই নির্ধারণের মূল কাজটি করে ক্রোমোজোম। আমাদের শরীর- কোষে থাকে ২৩ জোড়া ক্রোমোজোম, যার ২২ জোড়াকে বলা হয় অটোজোম (autosome) এবং অন্য দুটি সেক্স-ক্রোমোজোম (sex-chromosome), যা আবার দু' ধরনের—এক্স (X) ও ওয়াই (Y)। পুরুষের কোষে এই দু' ধরনের সেক্স ক্রোমোজোমই একটি করে থাকে (XY), কিন্তু নারীর কোষে থাকে শুধুমাত্র এক্স সেক্স-(XX) ক্রোমোজোম। জননকোষে আবার থাকে ২৩ জোড়া নয়, ২৩টি ক্রোমোজোম যার মধ্যে ২২টি অটোজোম একটি সেক্স ক্রেমোজোম। পুরুষের বীর্যে যে কোটি কোটি জননকোষ থাকে মোটামুটি তার অর্ধেকের মধ্যে থাকে এক্স ও বাকি অর্ধেকে ক্ষুদ্রতর ওয়াই সেক্স-ক্রোমোজোম। কিন্তু প্রতি ২৮ দিনের মাসিক ঋতুচক্রে নারীর দুটি ডিম্বাশয়ের কোন একটি থেকে যে একটি মাত্র স্ত্রী জননকোষ বেরোয়, তাতে সবসময়েই থাকে শুধু মাত্র এক্স-সেক্স ক্রেমোজোম, তার সহজ কারণ নারী-শরীরে ওয়াই সেক্স-ক্রোমোজোম থাকেই না। নারী-পুরুষের যৌনমিলনের পর পুরুষের কয়েক লক্ষ পুংজননকোষের মধ্যে সবচেয়ে সক্ষম যেটি নারীর

ঐ একমেবাদ্বিতীয়ম স্ত্রীজননকোষের সঙ্গে মিলিত হয়, ঐ পুংজননকোষে ঘটনাচক্রে যদি এক্স সেক্স- ক্রোমোজোম থাকে তবে সন্তানটি হবে কন্যা, কারণ তার সেক্স-ক্রোমোজোমের দুটিই হবে এক্স; অন্যদিকে যদি ঘটনাচক্রে তাতে থাকে ওয়াই সেক্স-ক্রোমোজোম তবে সন্তানটি হবে পুত্র, কারণ তার সেক্স-ক্রেমোজোমের একটি হবে এক্স, অন্যটি ওয়াই। স্পষ্টতঃই বারবার কোন দম্পতির কন্যা সন্তান হলে সাক্ষাৎ জন্মদাত্রী হিসেবে মা-কেই দায়ি করার গ্রাম্য কুসংস্কারটি সম্পূর্ণই ভুল, কারণ সন্তানের লিঙ্গ নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে মায়ের কোন ভূমিকাই নেই। যদি আদৌ কোন ভূমিকা থাকে তবে আসলে তা বাবার এবং সত্যি বলতে কি, এক্ষেত্রে বাবারও কিছু করার নেই,—তাঁর বীর্যের 'এক্স' না 'ওয়াই', কোন্ সেক্স-ক্রোমোজোম যুক্ত পুং জননকোষ মহোদয়টি স্ত্রী জননকোষের অঙ্গে ভিড়বে তা তাঁর ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপর বা শারীরিক ক্ষমতা-অক্ষমতার উপর নির্ভর করে না,—ব্যাপারটি মূলত কাকতালীয়।

উভয় জননকোষের মিলন ঘটে সাধারণতঃ নারীর ডিম্বনালী বা ফ্যালোপিয়ান টিউবে (fallopian tube-এ)। এখানে ঐ নিষিক্ত কোষ বিভক্ত হতে থাকে এবং কয়েকদিনের মধ্যে (সাধারণত তিন দিনের মধ্যে) নারীর জরায়ুতে চলে আসে আর এখানেই সেটি বিকশিত হতে থাকে। এটিই শিশুর ভ্রূণ। এই ভ্রূণই সুশৃঙ্খলভাবে বিভক্ত হতে হতে এক সময় সৃষ্টি করে সুস্থ পূর্ণাঙ্গ মানবশিশুর। এই শিশু ছেলে কি মেয়ে হবে তা প্রাথমিকভাবে নির্ধারণ করে জিন (gene), তথা আদি ভ্রূণ কোষের এক্স বা ওয়াই সেক্স ক্রোমোজোম। কিন্তু ভ্রূণাবস্থার শুরুর দিকে আরো কিছু কিছু শর্ত এটিকে প্রভাবিত করতে পারে। শুক্রাশয় (testis) বা ডিম্বাশয় (ovary) সৃষ্টি হয় ভ্রূণের একটি বিশেষ অংশ থেকে (mesodermal primordia in the genital ridge), যা শুক্রাশয় বা ডিম্বাশয় যে কোনটিই সৃষ্টি করার ক্ষমতা রাখে (bipotential) এবং এই অবস্থায় যদি ঐ ভ্রূণে পুং হরমোন বা স্ত্রী-হরমোন প্রয়োগ করা হয়, তবে লিঙ্গ পরিবর্তিত হয়ে যেতে পারে (অন্তত উভচরপ্রাণী ও পাখিদের ভ্রূণে এটি প্রমাণিত হয়েছে)। এ প্রসঙ্গে এটি উল্লেখ্য যে, সাধারণভাবে এখানে গর্ভস্থ শিশুকেই ভ্রূণ নামে অভিহিত করা হয়েছে। (তবে চিকিৎসাবিজ্ঞানের পরিভাষায়, নিষিক্ত হওয়ার পর প্রায় ৮ সপ্তাহ বা দু মাস সময়কাল অব্দি গর্ভস্থ ঐ শিশুটিকে বলা হয় embryo এবং তারপর জন্ম অব্দি তাকে বলা হয় foetus.)

পুরুষের প্রজনন প্রত্যঙ্গ

প্রজননের জন্য পুরুষের প্রধান অঙ্গ অন্ডাশয় বা অন্ডকোষ (testis)। অন্ডকোষ আবরণী (scrotum)-এর মধ্যে দু'দিকে দুটি প্রায় ডিম্বাকৃতি অন্ডকোষ থাকে। গর্ভস্থ শিশুর শরীরে এগুলি থাকে পেটের মধ্যে। জন্মের কাছাকাছি সময়ে এগুলি পেটের বাইরে চলে আসে। এগুলির বহিরাবরণ থাকে তন্তুময় (টিউনিকা অ্যালবুমিনিয়া)। এটি থেকে কিছু পাৎলা পর্দার মত অংশ অন্ডকোষের ভেতরে যায় এবং অন্ডকোষটিকে পিরামিডের মত দেখতে

বেশ কিছু অংশে বিভক্ত করে (লবিউলস, lobules)। প্রতিটি লবিউলে প্রায় ৫০০টি সুতোর মত সেমিনিফেরাস (seminiferous) টিবিউল থাকে। কিছু টিবিউল যুক্ত হয়ে সরলরেখার মত টিবিউল তৈরি করে, এগুলির কয়েকটি যুক্ত হয়ে তৈরি করে রেটি টেস্টিস (rete testis)। কিছু রেটি টেস্টিস পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে তৈরি করে ভাসা এফারেন্সিয়া। একটি অন্ডকোষের ভাসা এফারেসিয়াগুলি সংযুক্ত হয়ে তৈরি করে একটি এপিডিডিমিস নালিকা (duct of epididymis)। প্রায় ২০ ফুট লম্বা এই নালিকা অন্ডকোষের পেছনে পাকানো অবস্থায় থাকে। একসঙ্গে এই পাকানো নালিকাকে এপিডিডিমিস বলা হয় এবং পরে ঐ নালিকা ভাস ডেফারেন্স (vas deferens) নালিকা নামে অভিহিত হয়।

প্রতিটি সেমিনিফেরাস টিবিউলের গায়ে অসংখ্য পুংজননকোষ বা শুক্রকোষ (spermatozoa) তৈরি হয়। এর গায়ে, বাইরে থেকে ভেতরের দিকে পরপর থাকে ক্রমশ পরিণত হতে থাকা পুংজননকোষ (spermatozoa),—একেবারে বাইরে থাকে স্পার্মাটোগনিয়া, তারপর প্রাইমারি স্পার্মাটোসাইট, সেকেন্ডারি স্পার্মাটোসাইট, স্পার্মাটিড এবং সবশেষে পরিণত পুংজননকোষ (spermatozoa)। এই স্পার্মাটিড অবস্থা থেকেই ক্রোমোজোম এর সংখ্যা অর্ধেক হয়ে যায়, যা থাকে জননকোষেও।

অণ্ডকোষের ভেতরের গঠন

এপিডিডিমিস-এ পুংজননকোষ সঞ্চিত থাকে। এর শুরুর দিকে এবং সেমিনিফেরাস টিবিউলে স্পার্মাটোজোয়া স্থির অবস্থায় থাকে এবং স্ত্রীজননকোষ বা ডিম্বকোষ (ওভাম)- কে নিষিক্ত করার ক্ষমতাও তাদের অনেক কম। এপিডিডিমিসের দূরবর্তী স্থানে অর্থাৎ যতই তা অন্ডকোষ থেকে দূরে যায় ততই তার মধ্যকার জননকোষের গতি বৃদ্ধি পায় এবং নিষিক্ত করার ক্ষমতাও বাড়ে। এপিডিডিমিসের দু'দিক বেঁধে দিলে তার মধ্যে শুক্রকোষ ৬০ দিন পর্যন্ত বেঁচে থাকতে পারে, কিন্তু তাদের প্রজনন ক্ষমতা ৩০ দিনের মধ্যেই শেষ হয়ে যায়। দু'দিকের অন্ডকোষ কেটে ফেলে তারপর এপিডিডিমিস বেঁধে দিলে উভয় সময়কালই অর্ধেক হয়ে যায়। এর থেকে বোঝা যায় অন্ডকোষের কিছু নিঃসরণ (হরমোন) শুক্রকোষের সঞ্চালন ও প্রজনন ক্ষমতা—উভয়ই বৃদ্ধি করে। শুক্রকোষের প্রজনন ক্ষমতা অর্থাৎ ডিম্বকোষকে নিষিক্ত করার ক্ষমতা চূড়ান্ত অবস্থায় পৌঁছয় যৌনমিলনের পর নারীর

জরায়ুতে দুএকদিন থাকার পর। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, নারীর শরীরের মধ্যে শুক্রকোষ তিনদিন (৭২ ঘন্টা) পর্যন্ত জীবিত থাকতে পারে।

যৌনমিলনের পর যোনি ও জরায়ুমুখ (cervix) দিয়ে বীর্য জরায়ুতে প্রবেশ করে এবং প্রতি মিনিটে ১-৩ মিমি দূরত্ব অতিক্রম করে জরায়ুনালী বা ফ্যালোপিয়ান টিউবের ভেতর প্রবেশ করে। জরায়ুমুখ থেকে জরায়ুনালী বেয়ে ডিম্বাশয় পর্যন্ত পৌঁছতে শুক্রকোষের সময় লাগে মোটামুটি ৪৫ মিনিট। শুক্রকোষের নিজস্ব সঞ্চরণ ক্ষমতা, জরায়ুমুখের ক্ষারীয় রাসায়নিক পরিমন্ডল এবং যৌনমিলনের সময় নারীর জরায়ুর সংকোচন—এই সব মিলিয়েই বীর্য তথা শুক্রকোষের এই সঞ্চালন সম্ভব হয়। জরায়ু নালীতে যদি ডিম্বকোষ (ওভাম) থাকে তবে বীর্যে থাকা কয়েক লক্ষ শুক্রকোষের মধ্যকার সবচেয়ে শক্তিশালী, সবচেয়ে উপযুক্ত শুক্রকোষটি তার সঙ্গে মিলিত হয়। যদি ডিম্বকোষ না থাকে তবে ৭২ ঘন্টার মধ্যে শুক্রকোষগুলির মৃত্যু ঘটে।

বয়ঃসন্ধি (puberty) -র আগে পুরুষের অন্ডকোষে পূর্ণাঙ্গ শুক্রকোষ তৈরি হয় না। বয়ঃসন্ধির পর তা ক্রমান্বয়ে হতে থাকে এবং প্রায় সারাজীবন ধরেই তা অব্যাহত থাকে, যদিও বেশি বয়সে তার সংখ্যা কমতে থাকে। কিন্তু মেয়েদের ক্ষেত্রে যেমন প্রায় সর্বক্ষেত্রেই ৪৫-৫০ বয়সে রজোনিবৃত্তি (menopause) ঘটে এবং প্রজনন ক্ষমতা লুপ্ত হয় অর্থাৎ ডিম্বাশয় থেকে ডিম্বকোষ বেরোন বন্ধ হয়ে যায়, পুরুষদের ক্ষেত্রে এরকম নির্দিষ্ট কোন বয়স নেই। অধিকাংশ পুরুষ প্রাণীদের ক্ষেত্রে বছরের নির্দিষ্ট প্রজননকালে শুক্রকোষ সক্রিয় হয়, কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রে এরকম নির্দিষ্ট কোন প্রজনন কালও নেই। বছরের সব সময়েই পুরুষদের প্রজনন ক্ষমতা থাকে। প্রজননক্ষম নারীরাও বছরের প্রতি মাসেই প্রজননে সক্ষম, যদিও তাদের ক্ষেত্রে ২৮ দিনের মাসিক ঋতুচক্রের মাঝামাঝি সময়ে সাধারণতঃ একটি মাত্র ডিম্বকোষ নির্গত হয় এবং ঐ সময়টাই উর্বর সময়।

শুক্র কোষের আণুবীক্ষণিক গঠন

পুরুষদের অন্ডকোষে শুক্রকোষ তৈরি হওয়ার ব্যাপারটি মূলত নিয়ন্ত্রণ করে বিশেষ কয়েকটি হরমোন। পিটুইটারি গ্রন্থির ফলিকল স্টিমুলেটিং হরমোন (FSH) শুক্রকোষ তৈরির ব্যাপারটাকে (spermatogenesis) নিয়ন্ত্রণ করে এবং লুটিনাইকিং হরমোন (LH) অন্ডকোষ থেকে নির্গত পুং হরমোন (testosterone) -এর নিঃসরণকে নিয়ন্ত্রণ করে। পুরুষের শুক্রকোষের কার্যকারিতা তথা প্রজনন ক্ষমতা পিটুইটারি

গ্রন্থির নানা হরমোন এবং অন্ডকোষ থেকে নির্গত টেস্টোস্টেরন, উভয়ের দ্বারাই প্রভাবিত হয়।

শুক্রকোষ তৈরি হওয়ার ক্ষেত্রে তাপমাত্রার ভুমিকাও গুরুত্বপূর্ণ। উচ্চ তাপে (৩২ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের বেশি) শুক্রকোষ তৈরির প্রক্রিয়া কমে যায়। তাই যেসব পুরুষ ফার্নেস ইত্যাদির মত উচ্চ তাপযুক্ত স্থানে কাজ করেন, তাঁদের প্রজনন ক্ষমতা হ্রাস পায়। নিয়মিত হট বাথ নিলে (৪৩-৪৫ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় প্রতিদিন আধ ঘন্টা), বা খেলার সময় বিশেষ ধরনের অন্ডকোষ আবরণী (insulated support) নিয়মিত ব্যবহার করলে শুক্রকোষ তৈরি হওয়ার ব্যাপারটা শতকরা ৯০ ভাগ পর্যন্তও কমে যেতে পারে। শীতকালে বীর্যে শুক্রকোষের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় বলে দেখা গেছে। জন্মগত ত্রুটির কারণে অন্ডকোষ শৈশবে পেট থেকে বাইরে অন্ডকোষ আবরণী (scrotum)-এর মধ্যে না নেমে এলে, পেটের উচ্চতাপের কারণে শুক্রকোষ তৈরি হতে পারে না এবং এ ধরনের পুরুষ প্রায়শই বন্ধ্যা হয়। অন্ডকোষ আবরণী-র চামড়া কোঁচকানো এবং পুরু হয়। এতে থাকে ডার্টোস (dartos) নামে এক ধরনের বিশেষ মাংসপেশী, যা বিভিন্ন সময়ে সংকুচিত- প্রসারিত হয়ে অন্ডকোষ আবরণী-র বাইরের ক্ষেত্রফল তথা তাপবহির্গমনের ব্যাপারটিকে অতি সুন্দর ভাবে নিয়ন্ত্রণ করে। ফলে আবরণীর ভেতরে অন্ডকোষ দুটি শুক্রকোষ তৈরির অনুকুল, আদর্শ তাপমাত্রায় থাকতে পারে এবং এইভাবে অন্ডকোষের এই আবরণী (scrotum) অন্ডকোষ-এর একটি আদর্শ তাপনিয়ন্ত্রক (incubator)-এর ভুমিকা পালন করে।

মানুষের অণ্ডকোষের আণুবীক্ষনিক গঠন

বিশেষ কিছু ধরনের খাবার-দাবারও শুক্রকোষ তৈরির ব্যাপারটি নিয়ন্ত্রণ করে বলে দেখা গেছে। বয়ঃসন্ধির পূর্বেকার অপুষ্টি যদি প্রকট থাকে তবে পরে ঐ পুরুষের বন্ধ্যাত্ব দেখা দিতে পারে। অতিমাত্রায় ক্যালরি নিয়ন্ত্রণ, প্রোটিন জাতীয় খাদ্যের অভাব, এবং খাবারে ভিটামিন-এ, -ই, বি-১২, পিরিডক্সিন, ফলিক অ্যাসিড, প্যান্টোথেনিক অ্যাসিড, অ্যাসকর্বিক অ্যাসিড (ভিটামিন-সি) ইত্যাদির অভাব থাকলেও অন্ডকোষের কাজ তথা শুক্রকোষ তৈরির ব্যাপারটি বিপর্যস্ত হয়।

অন্ডকোষ (testis) থেকে শুক্রকোষ তথা পুংজনন কোষ (spermatozoa) এপিডিডিমিস হয়ে ভাস ডেফারেন্স (vas deferens) নামক নালিকা বেয়ে বীর্যথলি

(seminal veside)-এ জমা হয়। প্রস্টেট গ্ল্যান্ডের গা ঘেঁষে থাকা এই বীর্যথলির বীর্যপাত নালিকা (ejaculatory duct) প্রস্টেট গ্ল্যান্ডের ভেতর দিয়ে মূত্র নালি (urethra)-তে মুক্ত হয়। পুরুষের মূত্রথলি (urinary bladder) -এর ঠিক নীচে থাকা প্রস্টেট গ্ল্যান্ডের মধ্য দিয়ে মূত্রনালিকাও যায় এবং এই প্রস্টেটের মধ্যেই বীর্যপাত নালিকা মূত্রনালির সঙ্গে মিলিত হয়। এছাড়া কাছাকাছি থাকে কাউপার গ্রন্থি (Couper's gland or bulbourethral gland)। প্রস্টেটের ও এই গ্রন্থির ক্ষরণও বীর্যের সঙ্গে মেশে। বীর্যপাত (ejaculation)-এর সময় প্রথমে বীর্য মূত্রনালিতে আসে (emission) এবং পরবর্তী পর্যায়ে লিঙ্গের মাংসপেশীর সংকাচন-প্রসারণের দ্বারা এই বীর্য মূত্রনালি থেকে বাইরে (যৌনমিলনের সময় নারীর যোনিপথে) নিক্ষিপ্ত হয় (ejaculation proper)। উভয় প্রক্রিয়াই স্নায়ু নির্ভর এবং সুষুম্নাকান্ডের লাম্বার খন্ডগুলির নীচের ২-৩টি ও স্যাক্রাল খন্ডগুলির ওপরের ২-৩টি এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট।

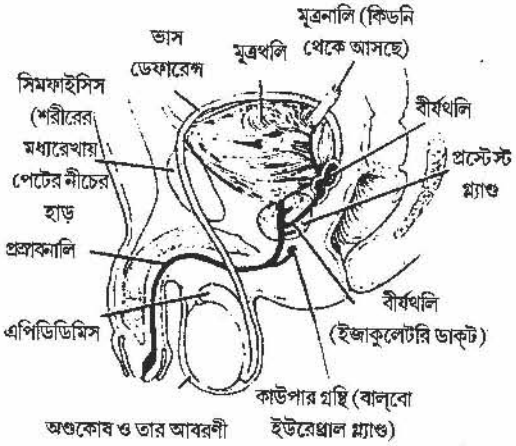

পুরুষের প্রজনন প্রত্যঙ্গ (শরীরের মধ্যরেখা বরাবার কেটে পাশ থেকে দেখা)

পুরুষের লিঙ্গ (penis) প্রজননের জন্য প্রাথমিক ভাবে প্রয়োজনীয় নয়। প্রজননের জন্য প্রয়োজন শুক্রকোষ। শুধু যৌনমিলনের জন্যই এই পুরুষালি অঙ্গটি গুরুত্বপূর্ণ। যৌনমিলন না হয়ে, কোন পুরুষের শুক্রকোষ সংগ্রহ করে, নারীর ডিম্বকোষের সঙ্গে পরীক্ষাগারে কৃত্রিমভাবে তাদের মিলন ঘটিয়েও সন্তানের জন্ম দেওয়া সম্ভব এবং তা বর্তমানে হচ্ছেও। সম্পূর্ণ বন্ধ্যা পুরুষও, লিঙ্গের জোরে ধর্ষণ থেকে পায়ু মিলন বা নারীর সঙ্গে যৌনমিলন করতে পারে কিন্তু সন্তানের পিতা হতে পারবে না। অন্যদিকে দুর্ঘটনায় লিঙ্গ কাটা গেলে বা লিঙ্গদৌর্বল্যের কারণে যৌনমিলন না করেও, কোন পুরুষ সন্তানের পিতা হতে পারেন।

মানুষের বীর্যের স্বাভাবিক গঠন

প্রতিবার বীর্যপাতে বীর্য বেরোয় গড়ে ২·৫-৩·৫ মিলিলিটার *

রঙ—সাদা, অধস্বচ্ছ, থকথকে

আপেক্ষিক গুরুত্ব—১·০২৮ (অর্থাৎ জলের থেকে সামান্য ভারি; জলের আপেক্ষিক গুরুত্ব ১·০)

হাইড্রোজেন আয়ন কনসেনট্রেশান (pH)—৭·৩৫-৭·৫ (অর্থাৎ ক্ষার জাতীয় বা অ্যালকালাইন)

শুক্রকোষ (পুং জননকোষ বা স্পার্ম)-এর সংখ্যা—প্রতি ঘন মিলি লিটারে প্রায় ১০ কোটি, এদের মধ্যে শতকরা ২০ ভাগের কম সংখ্যক শুক্রকোষ অস্বাভাবিক। যদিও নারীর ২৮ দিনের ঋতুচক্রের প্রায় মাঝামাঝি নিঃসরিত একটিমাত্র ডিম্বকোষের সঙ্গে একটি মাত্র শুক্রকোষ মিলিত হয়ে শিশুর জন্ম দেয়, তবু পুরুষের বীর্যে এই বিপুল সংখ্যক শুক্রকোষ প্রয়োজন হয়। (যে সব পুরুষের বীর্যে শুক্রকোষের সংখ্যা প্রতি মিলিলিটারে ২-৪ কোটি তাদের প্রায় অর্ধেক এবং যাদের ক্ষেত্রে সংখ্যা ২ কোটির কম, তারা প্রায় সবাইই বন্ধ্যা হয় অর্থাৎ তাদের সন্তানের জন্ম দেওয়ার ক্ষমতা থাকে না। অস্বাভাবিক শুক্রকোষের সংখ্যাও শতকরা ২০ ভাগের যত বেশি হতে থাকে, বন্ধ্যাত্বের সম্ভাবনাও ততই বাড়তে থাকে।)

বীর্যের তরল অংশ আসে—সেমিন্যাল ভেসিকল (বীর্যথলি) (শতকরা ৬০ ভাগ অংশ), প্রস্টেট (শতকরা ২০ ভাগ অংশ), কাউপার গ্রন্থি (গ্ল্যান্ড) ও প্রস্রাবনালীর গ্ল্যান্ড থেকে।

বীর্যের রাসায়নিক পদার্থগুলি—ফ্রুকটোজ (১.৫-৬.৫ মিলিগ্রাম প্রতিমিলিলিটারে), ফসফোরিলকোলিন, আর্গোথায়োনিন, অ্যাস্কর্বিক অ্যাসিড (ভিটামিন সি), ফ্লাবিন, প্রস্টাগ্ল্যান্ডিন, স্পার্মিন, সাইট্রিক অ্যাসিড, কলেস্টেরল ও ফসফোলিপিড, ফিব্রিনোলাইসিন ও ফিব্রিনোজেনেজ, জিংক, অ্যাসিড ফসফাটেজ, ফসফেট, বাই কার্বোনেট, হায়ালুরোনিডেজ।

শুক্রকোষের গতিবেগ—যৌনমিলনের পর নারীর অভ্যন্তরীণ যৌনাঙ্গ তথা জরায়ু ও ফ্যালোপিয়ান টিউবের মধ্যে প্রতিমিনিটে ৩ মিলিমিটার। যৌনমিলনের পর জরায়ুমুখ থেকে ফ্যালোপিয়ান টিউবে পৌঁছতে তার সময় লাগে ৩০-৬০ মিনিট।

শুক্রকোষের আয়ুষ্কাল—নারীর অভ্যন্তরীণ যৌনাঙ্গে, প্রায় ৩দিন (অর্থাৎ যৌনমিলনের তিনদিনের মধ্যে ডিম্বকোষ নিঃসরিত হলে সন্তানের জন্ম হতে পারে)।

* ঘনঘন যৌনমিলনের পর বীর্যের পরিমাণ ও বীর্যে শুক্রকোষের সংখ্যা দ্রুত কমতে থাকে।

পুরুষের লিঙ্গ (penis) একটি 'মাংসল' অঙ্গ। শরীরের এই একমাত্র অঙ্গই জীবনের বিশেষ সময়ে (বয়ঃসন্ধির সময় থেকে) নিজের চেহারার পরিবর্তন ঘটাতে পারে— দৈর্ঘ্যে, প্রস্থে, দৃঢ়তায়। এটি পুরুষের যৌনমিলনের অঙ্গ। এর মধ্যদিয়ে মূত্রনালিও যায়, যেটি দিয়ে বীর্যপাতও ঘটে। মূত্রনালির পথ অবিকৃত রেখে লিঙ্গ যদি কারোর শরীরে নাও থাকে, তবে যৌন মিলন না করতে পারার জন্য যে সব অসুবিধা হতে পারে সেগুলি ছাড়া অন্য কোন শারীরিক অসুবিধা হয় না। ব্যাপারটা প্রাণঘাতী তো নয়ই। অর্থাৎ প্রজনন ছাড়া লিঙ্গের অন্য কোন ভূমিকা নেই, নারীর জরায়ুর মত।

নরম অবস্থায় লিঙ্গের প্রস্থচ্ছেদ গোলাকৃতি, উচ্ছ্রিত অর্থাৎ দৃঢ় অবস্থায় ত্রিভুজাকার। শিথিল অবস্থায় এর সামনের দিকটিকে বলা হয় লিঙ্গের পিঠ (dorsum); শক্ত অবস্থায় এটি হয় ওপরের দিক। আর পেছনের দিকটি (শক্ত অবস্থায় নীচের দিকটি) মূত্রনালিকার

দিক (urethral surface)। লিঙ্গের পিঠের দিকে থাকে দুটি 'কর্পোরা ক্যাভার্নোসা পেনিস' (corpora cavernosa penis)—বাঁদিকে একটি ও ডানদিকে একটি, লিঙ্গের গোড়া থেকে গলা (neck) অব্দি। মূত্রনালিকার দিকে থাকে একটি 'কর্পাস স্পঞ্জিওসাম পেনিস' (corpus spongiosum penis) ; এর মধ্য দিয়েই মূত্রনালি বাইরে উন্মুক্ত হয়। এটি লিঙ্গের গোড়া থেকে কর্পোরা ক্যাভার্নোসা পেনিসের সামনের শেষ প্রান্ত অব্দি যায় এবং সেখানে এটি ডিমের মত বড় হয়ে যায়, যাকে বলা হয় লিঙ্গমুন্ড বা গ্ল্যান্স (glans penis)। এই লিঙ্গ মুন্ডের ওপরের দিকটিকেই অনেক সময় লিঙ্গের গলা (neck) হিসেবে অভিহিত করা হয়, যেখানে 'কর্পাস স্পঞ্জিওসাম পেনিস' প্রসারিত হয়ে লিঙ্গমুন্ড (glans)-এ পরিণত হচ্ছে।

লিঙ্গের চামড়া পাৎলা ও আলগাভাবে থাকে, এর রঙও গাত্রবর্ণের থেকে কৃষ্ণতর। লিঙ্গের গলার কাছে এটি ভাঁজ হয়ে যায় এবং চামড়ার এই ভাঁজের উপরের অংশটি লিঙ্গমুন্ডকে আবৃত করে রাখে। ভাঁজ হওয়া এই চামড়া সামনের দিকে উন্মুক্ত থাকে, যাতে মূত্রনালীর পথ খোলা থাকে। চামড়ার এই অংশকে বলা হয় প্রিপিউস (prepuce) বা লিঙ্গমুন্ড আবরণী। স্বাভাবিক অবস্থায় এই চামড়া পেছনের দিকে টানলে তা পেছনে সরে আসে লিঙ্গমুন্ডটি লিঙ্গের গলা অব্দি সম্পূর্ণ উন্মুক্ত হয়। যৌনমিলনের সময় উচ্ছ্রিত লিঙ্গ সংকীর্ণ যোনিপথে প্রবেশ করার সময় এই চামড়া (prepuce) পেছনে সরে এসে লিঙ্গমুন্ডকে সম্পূর্ণ উন্মুক্ত করে দেয়। লিঙ্গমুন্ড অতি সংবেদনশীল। যৌনমিলনের আনন্দ ও তৃপ্তি এই অতিসংবেদনশীল লিঙ্গমুন্ডের সঙ্গে যোনিপথের বারংবার ঘর্ষণের জন্য ঘটে। অনেক সময় জন্ম থেকেই কিছু কিছু বাচ্চা ছেলের লিঙ্গমুন্ড আবরণী চামড়াকে পুরোপুরি পেছনে সরানো যায় না। এই অবস্থার নাম ফাইমোসিস (phimosis)। শিশু বয়সেই অস্ত্রোপচার করে এটিকে ঠিক না করা হলে বড় হয়ে যৌনমিলনের সময় বা অন্য কোন ভাবে চামড়াটি সজোরে পেছনে টানার ফলে লিঙ্গমুন্ডের উপর জোরে আটকে যেতে পারে। এর ফলে যৌনমিলন যেমন যন্ত্রণাদায়ক ও অনেকসময় অসম্ভব হয়ে দাঁড়াতে পারে, তেমনি এইভাবে আটকে যাওয়ার ফলে মূত্রনালিও বন্ধ হয়ে গিয়ে বিপদ ডেকে আনতে পারে। ফাইমোসিস অল্প মাত্রায় থাকলে পরিষ্কার ও স্থানীয় নরম চামড়ার প্রদাহ ঘটাবে না এমন ধরনের তৈলাক্ত পদার্থ লিঙ্গমুখে দিয়ে (যেমন ভালো নারকেল তেল বা ক্রীম) বারবার অল্প অল্প পেছনে টানা ও লিঙ্গমুখের চামড়া ফাঁক করে করে এটিকে সংশোধন করা যায়। ছেলে জন্মানর পর মায়েরাই এটা দেখে নিয়ে ঠিক করে দিতে পারেন। অন্যথায় কম বয়সেই অস্ত্রোপাচার করিয়ে নেওয়া প্রয়োজন।

লিঙ্গমুন্ড আবরণী চামড়া (prepuce) পেছনে সরিয়ে লিঙ্গমুন্ড পরিষ্কার করারও প্রয়োজন হয়। লিঙ্গমুন্ড আবরণী চামড়ার নীচে, আবৃত লিঙ্গ মুন্ডের উপর এক ধরনের দুর্গন্ধ যুক্ত আঠালো পদার্থের নিঃসরণ ঘটে। এর নাম স্মেগমা (smegma)। এতে থাকে আঠালো ঘাম (sebum) জাতীয় পদার্থ, চামড়ার আলগা কোষ (desquamated epithelial cell)

ও জীবাণু। এই জীবাণুর কারণে স্মেগমার অন্য উপাদানগুলির পচন ঘটার জন্যই বিশেষ ধরনের দুর্গন্ধের সৃষ্টি হয়। দীর্ঘদিন এটি জমে থাকলে এর থেকে লিঙ্গের ক্যান্সার হতে পারে। তাই অন্তত বয়ঃসন্ধির পর মাঝে মাঝে চামড়া সরিয়ে লিঙ্গমুন্ডকে স্মেগ্‌মা থেকে পরিষ্কার করা উচিত। ফাইমোসিস থাকলে স্মেগ্‌মা দীর্ঘদিন জমে এই ক্যান্সারের সম্ভাবনা বাড়ায়। এছাড়া নিয়মিত যৌনমিলনের ফলেও স্বাভাবিকভাবেই স্মেগমা মুছে যায়। তাই চিরকুমার যে সব ব্যক্তি অজ্ঞতা বা সংস্কার বশত স্মেগমা পরিষ্কার করেন না, তাঁদের মধ্যে লিঙ্গের ক্যান্সারের হার বেশি। অন্যদিকে খৃষ্টান, মুসলিম বা অন্যান্য যে সব জনগোষ্ঠীর মধ্যে শিশু বয়সে পুত্র সন্তানের সুন্নৎ(circumcision) করে লিঙ্গমুন্ড আবরণী ঐ চামড়াকে বাদ দেওয়ার প্রথা প্রচলিত আছে, তাদের মধ্যে লিঙ্গের ক্যান্সারের হারও কিছুটা কম বলেই দেখা গেছে। যৌনমিলনের আগেও লিঙ্গমুন্ড থেকে স্মেগমা ধুয়ে ফেলা দরকার। অন্যথায় তা যোনিমুখে লেগে বা যোনির মধ্যে তার মধ্যে থাকা জীবাণুর দ্বারা সংক্রমণ ঘটিয়ে প্রদাহের সৃষ্টি করতে পারে। এমনকি তাড়াহুড়ো করার ফলে যোনিমুখের ঠিক উপরে থাকা মূত্রনালীর মুখে লেগেও তা সঙ্গিনীর মূত্রনালীর প্রদাহ ঘটাতে পারে। নববিবাহিত দম্পতি তথা যারা যৌনমিলন নতুন নতুন করছে, তাদের মধ্যে এটি প্রায়ই ঘটে, যাকে মজা করে হানিমুন জনিত মূত্রনালী প্রদাহ (honeymoon urethritis বা honeymoon urinary tract infection) হিসেবে বলা হয়। মজা করে বলা হলেও যে মেয়ের এটি হয় তার কাছে এটি যথেষ্ট যন্ত্রণাদায়ক। উপযুক্ত চিকিৎসা না করা হলে (প্রচুর জল খাওয়া, উপযুক্ত অ্যান্টিবায়োটিক, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা), বিশেষ করে দরিদ্র মহিলাদের ক্ষেত্রে এই ধরনের অপরিচ্ছন্নতা স্থায়িভাবে স্থানীয় অঞ্চলের প্রদাহ সৃষ্টি করতে পারে। তবে এ ব্যাপারটি আটকাতে শুধু পুরুষের স্মেগমা নয়, যৌনমিলনের আগে ও পরে নারীর স্থানীয় অঞ্চলটিও পরিষ্কার জল দিয়ে পরিষ্কার করে নেওয়ার অভ্যাস করা উচিত। বিশেষত আমাদের দেশের অধিকাংশ মেয়েই এইভাবে বহির্যৌনাঙ্গ পরিষ্কার করার ব্যাপারে এক ধরনের সংস্কার, অনীহা বা ছুঁৎমার্গিতায় ভোগে।

অনেকে মুখ দিয়ে যৌনক্রিয়া (oral sex) করেন। এ ক্ষেত্রেও মনে রাখা দরকার, কোনভাবে বীর্য মুখের মধ্যে গেলে তার থেকে কোন ক্ষতি হয় না, কারণ নীরোগ পুরুষের ক্ষেত্রে সেটি জীবাণুমুক্ত এবং তার মধ্যে কোন দূষিত পদার্থ থাকে না। কিছু স্মেগমার কারণে জীবানুসংক্রমণ ও অন্যান্য ঝামেলা হতে পারে।

লিঙ্গমুন্ড (glans)-এর নীচের দিকে বা পেছনের দিকে (অর্থাৎ মূত্রনালীর দিকে) আবরণী চামড়াটি দুদিক থেকে এসে সংযুক্ত হয়। একে বলা হয় ফ্রেনুলাম (frenulum)। লিঙ্গ মুন্ডের সংবেদনশীলতা এই ফ্রেনুলামে সর্বোচ্চ। এই আবরণী চামড়ার ভেতরের দিকে ও লিঙ্গের গলার কাছাকাছি অসংখ্য গ্রন্থি (preputial gland) রয়েছে, যার থেকেই বেরোয় ঐ আঠালো স্মেগমা। সুন্নৎ করে বা ফাইমোসিসের চিকিৎসায় এই চামড়া কেটে দিলে এই সব গ্ল্যান্ড গুলোও প্রায় সবটাই চলে যায়। ফলে স্মেগমার নিঃসরণ কমে যায়।

কর্পোরা ক্যাভার্নোসার ভেতরে থাকে অতিক্ষুদ্র থলির মত অসংখ্য ট্রাবেকুলি (trabeculae)। এর ফলে এর অভ্যন্তরীণ গঠন স্পঞ্জের মত। যৌন উত্তেজনার সময় স্নায়বিক প্রক্রিয়ায় রক্ত এই অজস্র ট্রাবেকুলির মধ্যে প্রবেশ করে, কিন্তু বেরোতে পারে না। ঘটে সফল যৌনমিলনের জন্য আকাঙ্খিত লিঙ্গের ঐ উত্থান। বীর্যপতনের পর এই স্নায়বিক উত্তেজনা ধীরে ধীরে প্রশমিত হতে থাকে, ট্রাবেকুলির সংকোচন ঘটে, রক্ত ধীরে ধীরে বেরিয়ে যায়, লিঙ্গ শিথিল হতে থাকে। কোন কারণে এই রক্ত বেরোতে দেরি হলে ঘটে লিঙ্গের দীর্ঘস্থায়ি যন্ত্রণাদায়ক উত্থান (priapism)।

বীর্যথলি (seminal vesicle) থাকে মূত্রাশয় ও প্রস্টেট গ্রন্থির পেছনে। এর নালিকা প্রস্টেট গ্রন্থির ভেতর দিয়ে গিয়ে প্রস্টেটের মধ্য দিয়ে যাওয়া মূত্রনালির সঙ্গে মিলিত হয়। বীর্যথলিতে বীর্য কিছু পরিমাণে জমা থাকে এবং যৌনমিলনের চরম অবস্থায় (Orgasm-এর সময়) তার সংকোচনের মাধ্যমে বীর্য মূত্রনালির ভেতর নিক্ষিপ্ত হয়।

বীর্যথলির ভেতরেও থাকে কিছু কিছু গ্রন্থি (glands) , যার থেকে জলীয় পদার্থের ক্ষরণ ঘটে এবং ফ্রুকটোজ তৈরি হয়। এই ক্ষরণ বীর্যের পরিমাণ বৃদ্ধিতে ও ফ্রুকটোজ শুক্রকোষের পুষ্টির জন্য প্রয়োজনীয়।

বয়ঃসন্ধি (puberty)-তে ছেলেদের শারীরিক পরিবর্তন(১২-১৬ বছর বয়সে)

১। লিঙ্গের দৈর্ঘ্য ও আয়তন বৃদ্ধি পায়। অন্ডকোষ আবরণী থলি (মুস্ক ; scrotum)-র চামড়ার রঙ কালো হতে থাকে এবং চামড়ায় ভাঁজ সৃষ্টি হয়।

২। বীর্যথলির আকার বৃদ্ধি পায়, ক্ষরণ শুরু হয় এবং ফ্রুকটোজ তৈরি হতে থাকে। প্রস্টেট ও মূত্রনালীর মধ্যকার গ্রন্থিগুলিও আকারে বড় হয় এবং তাদের ক্ষরণ শুরু হয়।

৩। স্বরযন্ত্র (larynx) আকারে বড় হয়, স্বরতন্ত্রী (vocal cord)-র দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি হয় ও মোটা হয়ে যায় ; গলার স্বর ভারি হতে থাকে।

৪। গোঁফ দাড়ি গজায়। বগলে-বুকে-মলদ্বারের চারপাশে চুল গজায়। বহির্যৌনাঙ্গে চুল বেরোয়। ছেলেদের ক্ষেত্রে এই যৌনচুল সামনের দিকে গোল (convex forwards); মেয়েদের ক্ষেত্রে উল্টো (concave forwards)। শরীরে চুলের পরিমাণ বাড়ে। মাথার চুলের বিন্যাস পুরুষালি হয়, পাশের দিকের চুল পেছনের দিকে সরে আসে।

৫। মানসিকভাবে মেয়েদের প্রতি আগ্রহ জন্মায়, মানসিকতা অনেক বেশি আক্রমণমুখী ও সক্রিয় হয়ে ওঠে। যৌন আকাঙ্খা সৃষ্টি হয়।

৬। কাঁধ চওড়া হয়, মাংসপেশী বৃদ্ধি পায়।

৭। সেবাম নামক আঠালো ঘাম নিঃসরণকারী গ্রন্থিগুলি (sebaceous gland) সক্রিয় হয়, সেবাম বেরোয় ও ঘন হয়, পরিমাণে বাড়ে (যার ফলে ব্রণ দেখা দিতে পারে)।

৮। সক্রিয় শুক্রকোষ সৃষ্টি হয়, বীর্যপাত শুরু হয়।

নারীর প্রজনন প্রত্যঙ্গ

প্রজননের জন্য নারীর প্রধান অঙ্গ হল ডিম্বাশয় (ovary) এবং জরায়ু (uterus)। জরায়ুর দু'দিকে দু'টি ডিম্বাশয় থাকে। এগুলি জরায়ুর ওপরের ও বাইরের অংশের সঙ্গে যুক্ত ডিম্বনালী বা জরায়ু নালিকা (uterine tube বা Fallopian tube)-র মারফৎ পরস্পরের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করে। জরায়ু যোনিপথ (vagina) -র মাধ্যমে বহির্জগতের সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষা করে। বাইরের দিকে যোনিমুখ মূত্রনালির মুখ বা প্রস্রাবদ্বার (uretheral opening) ও পায়ুছিদ্র বা মলদ্বার (anal opening)-এর মাঝামাঝি উন্মুক্ত হয়। এই পথ দিয়েই যৌনমিলনের সময় পুরুষের দৃঢ়লিঙ্গ প্রবেশ করে এবং যোনিপথের উপরের দিকে জরায়ু মুখ (cervix)-এ বীর্য ত্যাগ করে। এরপর বীর্য জরায়ুর মধ্যে প্রবেশ করে এবং তারপর ডিম্বনালী বা জরায়ু নালিকায় যায়। নারীর শরীরের মধ্যে বীর্যের কোটি কোটি শুক্রকোষ ৩ দিন পর্যন্ত জীবিত থাকতে পারে। ঐ সময়ের মধ্যে নারীর একমেবাদ্বিতীয়ম ডিম্বকোষ (ovum)-এর সঙ্গে ঐ জরায়ুনালিকার মধ্যে কোটি কোটি শুক্রকোষের একটি মাত্র মিলিত হতে পারে। সৃষ্টি হয় সন্তানের প্রাথমিক কোষ। পরবর্তীকালে কয়েকদিনের মধ্যে এই প্রাথমিক কোষ কয়েকভাগে বিভক্ত হয় এবং জরায়ুর মধ্যে চলে আসে। এখানেই তা বাড়তে থাকে। জন্মের তথা প্রসবের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত এই জরায়ুতেই আমরা বড় হয়েছি।

জরায়ুর আকার প্রায় নাসপাতির মত; এর ছুঁচলো অংশটি থাকে নীচের দিকে—যোনিপথের উপরে মুক্ত হয়। অগর্ভবতী পূর্ণবয়স্ক নারীর জরায়ুর আকার ৭.৫ সেন্টিমিটার × ৫ সেন্টিমিটার × ২.৫ সেন্টিমিটার ও ওজন ৩০-৪০ গ্রামের মধ্যে। মূত্রথলি ও মলাশয়ের মাঝামাঝি থাকে জরায়ু এবং মূত্রথলি যদি ফাঁকা থাকে তবে যোনিপথের সঙ্গে ৯০ ডিগ্রি কোণ করে জরায়ু সামনের দিকে ঝুঁকে থাকে। গর্ভাধান হলে কয়েকদিনের ভ্রূণ (blastocyst) জরায়ুনালি থেকে জরায়ুর মধ্যে চলে আসে এবং জরায়ুতে সুস্থিত হয়। গর্ভাবস্থায় ধীরে ধীরে জরায়ু বিপুল ভাবে বৃদ্ধি পায় এবং ওপর পেট পর্যন্ত চলে আসে। প্রসবের পর জরায়ুর ওজন ও আকার আগের চেয়ে সামান্য

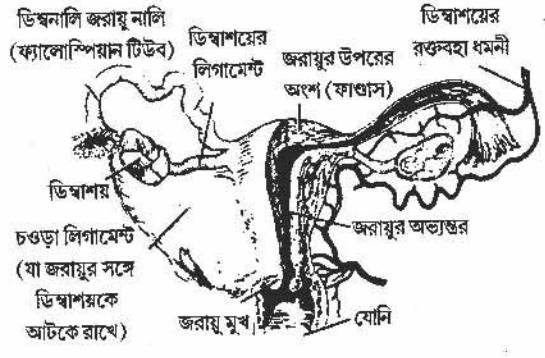

নারীর প্রজনন প্রত্যঙ্গ (সামনে থেকে দেখা)

বৃদ্ধি পায়, তবে প্রায় পূর্বের অবস্থায় ফিরে আসে। বৃদ্ধাবস্থায় জরায়ু আকারে ছোট হয়ে যায়। জরায়ুর নীচের অংশ জরায়ুমুখ (cervix)। স্বাভাবিক অবস্থায় এর দৈর্ঘ্য প্রায় ২.৫ সেন্টিমিটার। যোনিপথ বেয়ে আসা জীবাণু সংক্রমণের বিপদ ও যৌনমিলনের সময় লিঙ্গ মুন্ড (glans) -এর স্পর্শ এখানেই ঘটে। নারীর যৌনাঙ্গ-এর ক্যান্সার এইখানে বেশি ঘটে, বিশেষত গ্রামাঞ্চলে,—যার প্রধান কারণ পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার অভাব, বহু সন্তানের জন্ম, একাধিক যৌনসঙ্গী ও অপুষ্টি। (অন্যদিকে শহরাঞ্চলের নারীদের মধ্যে স্তন ক্যান্সারের প্রবণতা বেশি, যার প্রধান কারণ প্রসবের পর সন্তানকে বেশিদিন স্তন্যপান না করানো।)

নারীর ডিম্বকোষ (ovum) তৈরি হয় ডিম্বাশয় (ovary) -এ। তলপেটে দু'দিকে জরায়ুনালী তথা ডিম্বনালী (Fallopian tube)-এর বাইরের দিকের প্রান্ত ঘেঁষে থাকে দু'দিকে একটি করে মোট দু'টি ডিম্বাশয়। জন্ম থেকে মৃত্যু অব্দি নারীর এই ডিম্বাশয় জীবনের বিভিন্ন সময়ে তার আণুবীক্ষণিক চরিত্র পাল্টায়, —নারীর শরীরে আর কোন অঙ্গই এত বিপুলভাবে আণুবীক্ষণিকভাবে পরিবর্তিত হয় না। (তবে তুলনামূলকভাবে কম হলেও স্তনেরও পরিবর্তন ঘটে।)

ডিম্বকোষ (ovum) তৈরি হয় ডিম্বাশয়ে থাকা গ্রাফিয়ান ফলিকল (Graafian follicles) থেকে। জন্মের সময় এই গ্রাফিয়ান ফলিকল থাকে অতি প্রাথমিক অবস্থায় (primordial follicles)। মাতৃগর্ভস্থ কন্যার ডিম্বাশয়ে শুরুতে এর সংখ্যা থাকে প্রায় ৭০ লক্ষ। কিন্তু জন্মের আগেই তার বেশির ভাগ নষ্ট হয়ে যায় এবং নবজাতিকার ডিম্বাশয়ে এর সংখ্যা থাকে প্রায় ২০ লক্ষ। শিশুর বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে দ্রুত সেগুলিও ধ্বংস হতে থাকে। বয়ঃসন্ধির সময় এর সংখ্যা কমে আসে মাত্র এক থেকে তিন লক্ষে। এর মধ্যে প্রতি মাসিক ঋতুচক্রে মাত্র একটি করে পরিপূর্ণতা লাভ করে এবং মাসিক ঋতুর মাঝামাঝি একটি ডিম্বকোষ তৈরি করে, যেটি ডিম্বনালীতে প্রবেশ করে। শুক্রকোষ থাকলে তার সঙ্গে সেটি মিলিত হয়ে নতুন প্রাণের ভ্রূণ তৈরি করে। না হলে সেটি মারা পড়ে এবং পরবর্তী মাসিক ঋতুর রক্তের সঙ্গে ঐ মৃত ডিম্বকোষ বেরিয়ে যায়। তাই অনেকে কাব্য করে নারীর মাসিক ঋতুস্রাবকে শুক্রকোষের জন্য মুমূর্ষ ডিম্বকোষের 'কান্না' হিসেবে অভিহিত করেন।

বয়ঃসন্ধির সময় গ্রাফিয়ান ফলিকল-এর সংখ্যা ১ থেকে ৩ লক্ষ হলেও নারীর পুরো প্রজনন কালে মাত্র ৫০০টি পরিপূর্ণতা লাভ করে, বাকীগুলি বিনষ্ট হয় এবং মেনোপজের সময় একটিও গ্রাফিয়ান ফলিকল থাকে না। অর্থাৎ ঐ ৫০০টি গ্রাফিয়ান ফলিকলই এক নারীর জীবনে ৫০০ মাসিক ঋতুচক্রে ডিম্বকোষ দেয়। এই হিসেবে খুব স্থূলভাবে ধরলে বয়ঃসন্ধি (puberty) থেকে মেনোপজ অব্দি একজন নারীর মোট প্রজনন জীবন হচ্ছে ৫০০×২৮ = ১৪০০০ দিন তথা প্রায় ৩৮ বছর।

এবং নারীর প্রজনন জীবন এত বছর ধরেই চক্রাকারে পরিবর্তিত হয়, যা পুরুষের ক্ষেত্রে হয় না। আর পরিবর্তনের মূল উদ্দেশ্যই হচ্ছে নারীকে গর্ভবতী হওয়ার জন্য প্রস্তুত

করা তথা প্রজনন। মানুষ সহ সমগোত্রীয় অন্যান্য প্রাণীর ক্ষেত্রে (primates) এটিই মাসিক ঋতু চক্র (menstrual cycle) যার স্পষ্ট প্রকাশ ঘটে নিয়মিত যোনিপথ দিয়ে রক্তস্রাব (menstruation) এর মধ্য দিয়ে।

মাসিক ঋতুচক্রের সময়কাল গড়ে ২৮ দিন (চান্দ্রমাস) হলেও, তা কারোর ক্ষেত্রে ৩-৪দিন কম বা বেশি স্বাভাবিকভাবেই হতে পারে। এর শেষের দিকে যে রক্ত বেরোয় তা ৩-৫ দিন ধরে বেরোয়, কিন্তু সেটিও শুধু একদিনের জন্যই যেমন হতে পারে, তেমনি ৮দিন পর্যন্তও প্রলম্বিত হতে পারে, যাও অস্বাভাবিক নয়। এই রক্তক্ষরণ শুধু কয়েক ফোঁটার মধ্যেও সীমিত থাকতে পারে (spotting)। তবে গড়ে মোট রক্তক্ষরণ হয় ৩০ ঘন সেন্টিমিটার বা মিলিলিটার (প্রায় এক আউন্স)। অবশ্য কারো কারোর ক্ষেত্রে তা ৮০ ঘনসেন্টিমিটার অব্দিও হয়। কিন্তু তার বেশি হলে সেটি অস্বাভাবিক। বয়ঃসন্ধির কোন এক সময়ে এটি শুরু হয় (menarch), চলে রজোনিবৃত্তি বা মেনোপজ (menopanse) পর্যন্ত। সাধারণত শুরুর এই বয়সটা ১১-১৩ বছর। কিন্তু এটি দু'এক বছর আগেও শুরু হতে পারে এবং সম্প্রতিকালের মেয়েদের মধ্যে এইভাবে একটু কম বয়সে মাসিক ঋতুচক্র শুরু হওয়ার প্রবণতাই লক্ষ্য করা যাচ্ছে। একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে বিগত প্রায় ১৮০ বছর ধরে ইয়োরোপ ও আমেরিকার মেয়েদের মাসিক ঋতুস্রাব শুরু হওয়ার গড় বয়স প্রতি ১০ বছরে ১-৩ মাস ধরে কমেছে। রজোনিবৃত্তির বয়সও গড়ে ৪৫ বছর হলেও আরো দু'চার বছর তা প্রলম্বিত হতে পারে। প্রতি ঋতুচক্রের মাঝামাঝি সময়ে ডিম্বাশয় (ovary) থেকে ডিম্বকোষ (ovum) নির্গত হয় (ovulation)। কিন্তু কৈশোরে মাসিক প্রথম শুরু হওয়ার পরবর্তী ১২-১৮ মাসের এবং রজোনিবৃত্তির পূর্বেকার কয়েকমাসের ঋতুচক্রে কোন ডিম্বকোষ অনেক সময় নির্গত হয় না (anovulatory cycle)। কিন্তু তা না হলেও রক্তস্রাব যেমন হওয়ার তা হয়, তবে সাধারণত তা ঘটে ২৮ দিনের আগে এবং রক্তের পরিমাণ দু'চার ফোঁটা থেকে বেশ বেশি পরিমাণেই হতে পারে।

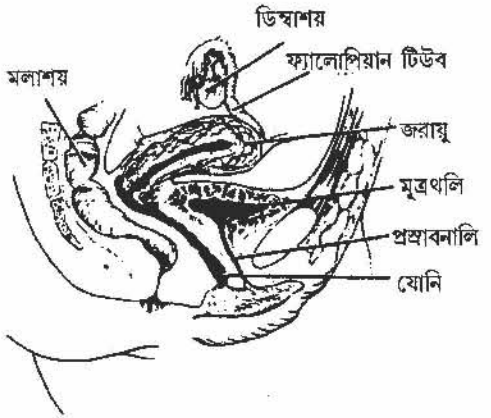

নারীর প্রজনন প্রত্যঙ্গ (মধ্যরেখা বরাবর কেটে পাশ থেকে দেখা

প্রচলিতভাবে মাসিক ঋতুচক্রের দিন গোনা শুরু হয় ঋতুস্রাব (menstruation) এর

প্রথম দিন থেকে অর্থাৎ যেদিন রজোদর্শন হল সেদিন থেকে, পরেরটির আগের দিন পর্যন্ত (যা গড়ে এক চান্দ্র মাস বা ২৮ দিন)। ঋতুচক্রের ৬ষ্ঠ দিন থেকে দু'টি ডিম্বাশয়ের সহস্র সহস্র গ্রাফিয়ান ফলিকল-এর মধ্যে মাত্র একটি দ্রুত বিকশিত হতে থাকে। গোনাডোট্রফিন হরমোন (pruified human pituitary gonadotrophin) ইনজেকশান করে প্রয়োগ করা হলে একসঙ্গে একাধিক গ্রাফিয়ান ফলিকল-এর বিকাশ ঘটতে পারে এবং একসাথে বহু সন্তানের জন্ম সম্ভাবনা দেখা দেয়। তবে বিরল ক্ষেত্রে কোন কোন মহিলার ক্ষেত্রে ২-৩ টি গ্রাফিয়ান ফলিকলও স্বাভাবিকভাবেই বিকশিত হয়ে যমজ বা তার বেশি শিশুর জন্ম ঘটাতে পারে।

অন্যথায় ঐ একটি গ্রাফিয়ান ফলিকলই বড় হতে থাকে, তার থেকে ইস্ট্রোজেন হরমোন বেরোয়। এর মধ্যে বিকশিত হতে থাকে প্রজননক্ষম ডিম্বকোষটি (ovum)। ঋতুচক্রের ১৪দিনের মাথায় এই ফলিকল ফেটে যায় এবং তার থেকে এই ডিম্বকোষটি বেরিয়ে ডিম্বাশয়ের বাইরে ডিম্বনালীর বাইরের প্রান্তের কাছাকাছি উদর গহ্বরে (abdominal cavityতে) পড়ে (ovulation)। এখান থেকে ডিম্বনালীর বাইরের প্রান্তে থাকা সরু আঙ্গুলের মত অঙ্গগুলি (fimbriated part) ডিম্বকোষটি গ্রহণ করে এবং ডিম্বনালীর মধ্যে ডিম্বকোষটি প্রবেশ করে। ডিম্বকোষ নির্গমনের এই প্রক্রিয়ায় অনেক সময় ফলিকল থেকে সামান্য রক্তপাত ঘটে এবং এর ফলে উদরগহ্বরের স্থানীয় অঞ্চলে (অর্থাৎ তলপেটের দু'দিকের কোন একটি দিকে) প্রদাহ ঘটে, —ফলে ব্যথা ও অস্বস্তি হয়। মাসিকের ১৪ দিনের মাথায় বা মাঝামাঝি তলপেটে অনেক মহিলাই এইভাবে ব্যথা অনুভব করেন (mittelschmerz) যা আসলে ডিম্বকোষ নির্গমন (ovulation)-এর লক্ষণ।

পূর্ণবিকশিত ডিম্বকোষ বেরিয়ে যাওয়ার পর ফলিকল-এর দ্রুত নানাবিধ পরিবর্তন

মানুষের মত স্তন্যপায়ী প্রাণীর ডিম্বাশয়ের অভ্যন্তরীণ গঠন

ঘটতে থাকে। এই পরিবর্তিত গ্রাফিয়ান ফলিকলটিকে কর্পাস লুটিয়াম (corpus luteum)

বলা হয়। এর থেকে ইস্ট্রোজেন ও প্রজেস্টেরন হরমোন বেরোয়। মাসিক চক্রের শুরুর দিকে ক্রমশ ইস্ট্রোজেন হরমোনের নিঃসরণ বাড়ছিল, যা আসছিল গ্রাফিয়ান ফলিকল থেকে। এই ইস্ট্রোজেন আবার গ্রাফিয়ান ফলিকলকে পিটুইটারি গ্রন্থি থেকে বেরোন ফলিকল স্টিমুলেটিং হরমোন (FSH)-এর প্রতি সংবেদনশীল করে তোলে। ডিম্বকোষ নির্গমন (ovulation)-এর সময় ইস্ট্রোজেনের পরিমাণ সর্বাধিক হয়। আর এই উচ্চ মাত্রার ইস্ট্রোজেন ফলিকল স্টিমুলেটিং হরমোনকে প্রতিহত করে, কিন্তু পিটুইটারি গ্রন্থির আরেক হরমোন লুটিনাইজিং হরমোন (LH)-এর ক্ষরণ ঘটায়। এর প্রভাবেই ডিম্বকোষ বেরিয়ে যাওয়ার পর গ্রাফিয়ান ফলিকল পরিবর্তিত হয়ে কর্পাস লুটিয়ামে পরিণত হয়। মাসিক ঋতুচক্রের ১৯ দিনের মাথায় (অর্থাৎ ovulation -এর ৪-৫ দিন পর) এই কর্পাস লুটিয়াম তার পরিপূর্ণ আকার ধারণ করে। এই সময়ের মধ্যে যদি শুক্রকোষের সঙ্গে ডিম্বকোষের মিলন না হয় অর্থাৎ সংশ্লিষ্ট নারী গর্ভবতী না হয় তবে এই কর্পাস লুটিয়াম ঋতুচক্রের ২৭ দিন পর্যন্ত তার অস্তিত্ব বজায় রাখে, ২৮ দিনের মাথায় সেটি বিনষ্ট হয় (আর তারপর শুরু হয় রক্তস্রাব)। এই ধরনের কর্পাস লুটিয়ামকে বলা হয় মিথ্যা (false corpus luteum বা Corpus Luteum of Menstruation)। কিন্তু যদি গর্ভাধান ঘটে তবে এটি বৃদ্ধি পেতে থাকে, এর থেকে বেরোন প্রজেস্টেরন হরমোন মাতৃগর্ভে (জরায়ুতে) ভ্রূণের স্থিতির জন্য প্রয়োজনীয় গর্ভপুষ্প (placenta) সৃষ্টিতে সাহায্য করে, এই গর্ভপুষ্প থেকে বেরোন গোনাডোট্রফিন হরমোন কর্পাস লুটিয়ামকে আরো সক্রিয় করে, আরো প্রজেস্টেরন বেরোয়, গর্ভপুষ্প পূর্ণবিকশিত হয়। এই কর্পাস লুটিয়ামকে বলা হয় প্রকৃত কর্পাস লুটিয়াম (true corpus luteum বা Corpus Luteum of Pregnancy)। এই প্রজেস্টেরনের জন্যই জরায়ুর অভ্যন্তরীণ আবরণীর যথোপযুক্ত পরিবর্তন ঘটে, যাতে ভবিষ্যৎ শিশু স্বাভাবিকভাবে গর্ভপুষ্পের মাধ্যমে জরায়ুতে সুস্থিত থাকতে পারে ও মায়ের শরীর থেকে মায়ের রক্তের মাধ্যমে পুষ্টি পেতে পারে। কিন্তু গর্ভাধান না হলে অর্থাৎ ঐ সময় যৌনমিলন না হলে তথা ডিম্বকোষটি শুক্রকোষের সঙ্গে মিলিত না হলে, অতি উচ্চমাত্রার প্রজেস্টেরন লুটিনাইজিং হরমোনের ক্ষরণকে বাধা দেয়, ফলে কর্পাস লুটিয়ামের আরো বিকাশ তথা আরো প্রজেস্টেরন নিঃসরণ প্রতিহত হয়। (তারপর কর্পাস লুটিয়াম স্থায়িভাবে নিষ্ক্রিয় হয়ে যায় (corpus albicans)।) এর ফলে ভাবী ভ্রূণের জন্য জরায়ুতে যে বিছানা করা হয়েছিল তা ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়, অর্থাৎ প্রসারিত রক্তবহানালী ও জরায়ুর অভ্যন্তরীণ আবরণী কোষ ছিন্ন হয়। এর ফলে যে রক্ত বেরোয় সেটিই মাসিক ঋতুস্রাব হিসেবে যোনিপথ দিয়ে বেরিয়ে আসে, —প্রায় ২৮ দিনের মাথায় বা তার ঠিক পরে পরেই। শুরু হয় মাসিক ঋতুচক্রের পরবর্তী চক্রটি। এইভাবেই নারীর পুরো প্রজননকাল ধরে মাসের পর মাস ঘটতে থাকে সন্তানের জন্য জরায়ুর প্রস্তুতি, তার অভাবে 'হতাশায়' রক্তক্ষরণ অথবা ভ্রূণ পেলে 'সানন্দে' তাকে আসীন করা।

এই আসন তৈরি হয় আমাদের মায়ের জরায়ুতে। মাসিক ঋতুস্রাবের সময় জরায়ুর অভ্যন্তরীণ অংশের গভীরতর স্তর ছাড়া উপরের দিকের সমস্ত অংশই ছিন্ন হয়ে বেরিয়ে যায়। এই ঋতুস্রাব বন্ধ হওয়ার পর থেকেই গ্রাফিয়ান ফলিকল থেকে বেরুন ইস্ট্রোজেনের প্রভাবে এই অংশের আবার দ্রুত পুনর্গঠন শুরু হয়,—ঋতুচক্রের ৫ম থেকে ১৪দিন পর্যন্ত। জরায়ুর গ্রন্থিগুলি (uterine glands) দীর্ঘতর হয়। ঋতুচক্রের এই সময়কালকে বলা হয় বিভাজক বা প্রাক্ ডিম্বস্ফোটন অবস্থা (proliferative phase বা preovulatory phase)। চতুর্দশ দিনে ডিম্বকোষ নির্গমনের পর ২৮ তম দিন পর্যন্ত কর্পাস লুটিয়াম থেকে নিঃসৃত ইস্ট্রোজেন ও প্রজেস্টেরন হরমোনের প্রভাবে জরায়ুর অভ্যন্তরীণ আবরণীতে (endometrium-এ) রক্তসঞ্চালন আরো বৃদ্ধি পায়, দীর্ঘগ্রন্থিগুলি পাকিয়ে যায় এবং তার থেকে পরিষ্কার জলীয় পদার্থ নিঃসরিত হতে থাকে। ঋতুচক্রের এই সময়কালকে বলা হয় ক্ষরণকারী অবস্থা (secretory phase বা luteal phase)। ঋতুচক্রের এই অংশটির এই ১৪ দিনের সময়কাল অদ্ভুতভাবে সুনির্দিষ্ট। কোন কোন মহিলার ক্ষেত্রে ঋতুচক্রের মোট সময়কাল গড় ২৮ দিনের কম বা বেশি যখন হয়, তখন তা হয় অন্য অংশগুলির সময়কালের পরিবর্তনের জন্য।

ঋতুচক্রের এই অবস্থায় ডিম্বকোষের সঙ্গে শুক্রকোষের সঙ্গে মিলন না হলে কর্পাস লুটিয়াম ধীরে ধীরে নিষ্ক্রিয় হতে থাকে। ফলে ভাবী ভ্রূণের জন্য জরায়ু যে স্থান তৈরি করেছিল, সেটি আর হরমোনগত সহায়তা পায় না। ফলে জরায়ুর অভ্যন্তরীণ আবরণী পাৎলা হতে থাকে, তার কোন কোন জায়গায় তথা রক্তবহানালিকায় ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ছিদ্র হতে থাকে, পরে এগুলি আকারে বড় হয়। স্থানীয় এলাকায় নিঃসরিত প্রস্টাগ্ল্যান্ডিন-এর প্রভাবে এই রক্তবহানালিকাগুলির সংকোচন ঘটে। ফলে ক্ষরণকারী অবস্থার শেষে ২৮ দিনের পর শুরু হয় রক্তক্ষরণ। শুরু হয় পরবর্তী চক্র। এইভাবে ঋতুচক্রের মূলত দুটি ভাগ—

(১) ১৪ দিনের বিভাজক অবস্থা, যার প্রথম ৪দিন ঘটে রক্তস্রাব এবং এই অংশের সময়কাল বিভিন্ন নারীর ক্ষেত্রে পরিবর্তিত হতে পারে।

(২) ১৪ দিনের ক্ষরণকারী অবস্থা (যার সময়কাল সবার ক্ষেত্রেই প্রায় নির্দিষ্ট)।

মাসিক রক্তস্রাবে মোটামুটি যা থাকে তা হল—

(১) মোট প্রায় ৩০ মিলিলিটার রক্ত (যার শতকরা ৭৫ ভাগ আসে ধমনী থেকে এবং ২৫ ভাগ আসে শিরা থেকে);
(২) জরায়ুর ছিন্ন কোষগুলি,
(৩) প্রস্টাগ্ল্যান্ডিন,
(৪) ফিব্রিনোলাইসিন (এই ফিব্রিনোলাইসিনের জন্যই রক্ত জমাট বেঁধে যায় না; তবে অতিরিক্ত রক্তস্রাব হলে কিছু রক্ত জমাট বাঁধতে পারে)।

মাসিক ঋতুচক্রের সময় শুধু ডিম্বকোষ বা জরায়ুর ভেতরটা নয়, জরায়ু মুখ (cervix) থেকে বেরোন শ্লেষা (মিউকাস, mucus)-এরও পরিবর্তন ঘটে। মাসিক ঋতুচক্রের প্রথম অবস্থায় ইস্ট্রোজেনের প্রভাবে এই মিউকাস পাৎলা হয়ে যায় এবং রাসায়নিক চরিত্র হয় ক্ষারীয় (alkaline)। এরও উদ্দেশ্য হচ্ছে, ১৪ দিনের কাছাকাছি অর্থাৎ ডিম্বকোষ নির্গমনের সময় যৌনমিলন হলে শুক্রকোষ যাতে তার সহায়ক রাসায়নিক পরিবেশ পেয়ে ঠিকমত জরায়ুতে প্রবেশ করতে পারে। এর পরবর্তী সময়ে প্রোজেস্টেরনের প্রভাবে এই মিউকাস ঘন ও আঠালো হয়ে যায়। ডিম্বকোষ নির্গমনের (ovulation)-এর সময় জরায়ু মুখের এই মিউকাস (তথাকথিত সাদাস্রাব) পরিমাণেও একটু বাড়ে এবং সবচেয়ে পাৎলা হয়ে যায়। এই সময় এই মিউকাসের স্থিতিস্থাপকতা (spinnbarkeit) এতই বাড়ে যে এক ফোঁটাকে টেনে ১০-১২ সেন্টিমিটার বা তারও বেশি করা যায়। কাঁচের স্লাইডের উপর এই মিউকাস ছড়িয়ে দিয়ে অনুবীক্ষণ যন্ত্রে দেখলে তা ফার্নের পাতার মত দেখতে লাগে। ডিম্বকোষ বেরিয়ে যাওয়ার পর এই মিউকাস ক্রমশ ঘন হয়ে যায় তার স্থিতিস্থাপকতাও কমে যায় এবং স্লাইডের উপর ছড়ালে ঐ ভাবে ফার্নের চেহারা আর নেয় না।

ডিম্বকোষ নির্গমন (ovulation)-এর দিনটিকে বোঝার উপায়—২৮ দিনের ঋতুচক্রের মাঝামাঝি সময়ে যখন কোন একটি ডিম্বাশয় থেকে ঐ একটিমাত্র ডিম্বকোষ বেরোয়, তখন নারীর শরীরে বেশ কিছু পরিবর্তন ঘটে। পুরুষের ক্ষেত্রে এসবের কোন বালাই নেই। প্রতিবার বীর্যপাতে তার কয়েক কোটি শুক্রকোষ বেরোয়; প্রাণকোষের এত অপচয় প্রাকৃতিকভাবে বোধ হয় আর কোথাও হয় না। আর তাই বোধহয় তাদের বাঁচানোর জন্য পুরুষের স্বাভাবিক প্রবণতা বিশেষ কিছু নেই—যৌনাঙ্গ সম্পর্কিত শালীনতা বা রক্ষণশীলতা তুলনামূলকভাবে অনেক কম। অন্যদিকে অতি মূল্যবান ঐ একটিমাত্র ডিম্বকোষকে বাঁচানো ও তার যথার্থ ব্যবহার করা (সন্তানের জন্ম দেওয়া)-র তাগিদ—এ কারণেই যথাসম্ভব প্রাকৃতিকভাবে যৌনাঙ্গ সম্পর্কিত নারীর লজ্জা, শালীনতা ও রক্ষণশীলতা পুরুষের তুলনায় এত বেশি।

ডিম্বকোষ নির্গমনের সময় অর্থাৎ ঋতুচক্রের মাঝামাঝি সময়ে নারীর যৌন আকাঙ্খা কিছুটা বৃদ্ধি পায় বলেও দেখা গেছে। এটিও ঘটে ইস্ট্রোজেনের প্রভাবে এবং প্রজননের জন্য প্রাকৃতিক কৌশলের অংশ হিসেবে। একটি সমীক্ষার দেখা গেছে, এই সময় নারীদের মধ্যে সাজসজ্জা, প্রসাধন, রঙীন জামাকাপড় পরা তথা পুরুষদের চোখে আকর্ষণীয় হিসেবে হাজির করার প্রবণতাও কিছুটা বাড়ে,—হয়তো তা সচেতনভাবে ততটা আদৌ নয়।

ঠিক কবে ডিম্বকোষ বেরুচ্ছে সেটি জানা থাকলে সন্তানেচ্ছু মহিলা যেমন ঐ সময় যৌনমিলনের উদ্যোগ নিতে পারেন, তেমনি যাঁরা সন্তান চান না তাঁরা, পরিবার পরিকল্পনার অংশ হিসেবে, ঐ সময়ের আগে পরে মোট ৬-৭ দিন যৌনমিলন পরিহার করতে পারেন। এছাড়া সন্তানহীন দম্পতির সন্তানহীনতার কারণ স্ত্রীর ডিম্বকোষ না বেরনো কিনা, সেটিও

ডিম্বকোষ নির্গমনের লক্ষণ বিচার করে প্রাথমিকভাবে বলা যায়। যেমন—

(১) তাপমাত্রার বৃদ্ধি—ডিম্বকোষ নির্গমনের সময় সাধারণত: শরীরের তাপমাত্রার বৃদ্ধি ঘটে। যথাসম্ভব এটি ঘটে ঠিক ঐ সময় প্রজেস্টেরন হরমোন বেরনোর কারণে। এটি ধরার জন্য ঋতুচক্রের প্রথম দিন থেকে, প্রতিদিন সকালে ঘুম ভাঙ্গার পর বিছানা ছাড়ার আগে, একই থার্মোমিটারে শরীরের একই জায়গায় (মুখে বা মলাশয়ে) তাপমাত্রা দেখা এবং তা লিখে রাখা দরকার। ডিম্বকোষ যখন বেরোয় ঐ সময় তাপমাত্রা ০.৩-০.৫ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড বৃদ্ধি পায় এবং পরবর্তী ঋতুস্রাব অব্দি থাকতে পারে। যদি তাপমাত্রার কোন পরিবর্তন না হয় তাহলে বুঝতে হবে ঐ মাসিক ঋতুচক্রে ডিম্বকোষ বেরোয়নি (anovulatory cycle)।

(২) 'সাদাস্রাব'—আগেই বলা হয়েছে ডিম্বকোষ নির্গমনের সময় জরায়ু মুখ থেকে নিঃসৃত শ্লেষা (cervical mucus) খুব পাৎলা ও স্থিতিস্থাপক হয়ে যায়। তাই ঋতুচক্রের মাঝামাঝি সময়ে যদি যোনিপথ দিয়ে চটচটে জলীয় পদার্থ বেরোয় এবং দু'আঙ্গুলে নিয়ে তা টানলে সুতোর মত লম্বা হয়ে যায় তবে ঐ সময় ডিম্বকোষ বেরিয়েছে বলে অনুমান করা যায়। সম্ভব হলে কোন সাধারণ অনুবীক্ষণ যন্ত্রে দেখার জন্য কাচের স্লাইডের উপর ঐ মিউকাসের এক ফোঁটা ছড়িয়ে দেওয়া যায়। শুকিয়ে যাওয়ার পর অনুবীক্ষণ যন্ত্রে দেখলে দেখা যাবে সাধারণ কিছু কোষের সঙ্গে ফার্নের মত ছবিও দেখা যাচ্ছে। [তবে ঐ মিউকাসের এই ফার্নের মত চেহারা ঘটে ইস্ট্রোজেন হরমোনের প্রভাবে। ডিম্বকোষ বেরনোর পর কর্পাস লুটিয়াম থেকে যে প্রজেস্টেরন বেরোয়, সেটি এই ফার্নের মত চেহারা হতে বাধা দেয় এবং মিউকাসে বহু সাধারণ কোষের উপস্থিতি ঘটায়। মাসিক ঋতুস্রাব (menstruation) হচ্ছে কিন্তু ডিম্বকোষ বেরোয়নি (anovulatory cycle) —এমন অবস্থায় মিউকাস নিয়ে স্লাইডে পরীক্ষা করলে দেখা যাবে তাতে শুধুই ফার্নের ছবি, কোন সাধারণ কোষ নেই। এটি ঘটে কর্পাস লুটিয়াম তৈরি না হওয়ার জন্য কোন প্রজেস্টেরন না বেরুন এবং তার প্রভাব না থাকার কারণে। এই ধরনের ঋতুচক্রে শুধুই ইস্ট্রোজেনের কারণে জরায়ুর অভ্যন্তরীণ আবরণী অনেক পুরু হতে হতে এক সময় ছিঁড়ে যায় এবং তার থেকে রক্তপাত (menstruation) হয়।]

(৩) অন্যান্য পরিবর্তন — (ক) প্রস্রাবে গোনাডোট্রফিনের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়; (খ) যোনিপথের অভ্যন্তরীণ আবরণীতে বড় বড় অম্ল সংবেদী কোষ (large acidophilic squamous cell)-এর সংখ্যাবৃদ্ধি (গ) ডিম্বকোষ নির্গমনের ঠিক আগে ইস্ট্রোজেনের নিঃসরণ বৃদ্ধি পেয়ে চূড়ান্ত অবস্থায় পৌঁছয়; (ঘ) ডিম্বকোষ নির্গমনের ৩-৪ দিন পর প্রেগনানোডিয়ল (pregnanodiol)-এর পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। কোন মাসিক ঋতুচক্রে ডিম্বকোষ নির্গমন না ঘটলে (anovulatory cycle) রক্তস্রাব (menstruation) হলেও উপরোক্ত পরিবর্তনের কোনটিই ঘটে না।

উর্বর সময় (fertile period) ও নিরাপদ সময় (safe period)

মাসিক ঋতুচক্রের মাঝামাঝি (অর্থাৎ ১৪দিনের মাথায়) লুটিনাইজিং হরমোন (LH) ক্ষরণের ৩৬-৩৮ ঘণ্টার মধ্যে ডিম্বকোষ (ovum) নির্গত হয়। এই বেরুনর পর ডিম্বকোষ যদি ৩৬ ঘন্টার মধ্যে উপযুক্ত সংখ্যক শুক্রকোষ পায় তবে তার একটির সঙ্গে মিলিত হয়ে সন্তানের দিতে পারে। তবে ডিম্বকোষটি জীবিত থাকে আরো প্রায় ৩৬ ঘন্টা অর্থাৎ ডিম্বকোষের আয়ু সর্বমোট ৭২ ঘন্টা বা তিনদিন। অন্যদিকে যৌনমিলনের পর জরায়ু তথা ডিম্বনালীতে প্রবেশের পর শুক্রকোষ (spermatorza)ও জীবিত থাকতে পারে সর্বাধিক ৭২ ঘন্টা। তাই ২৮ দিনের মাসিক ঋতুচক্রের মাঝামাঝি মোট প্রায় ১২০ ঘন্টা (৫দিন) হচ্ছে উর্বর সময়,—এই সময় যৌনমিলন হলে সন্তানের জন্ম হতে পারে। মোটামুটি মাসিকের ১৪ দিনের মাথায় ডিম্বকোষ হচ্ছে ধরে নিয়ে তার ২-৩ দিন আগে ও ২-৩ দিন পরে হচ্ছে এই উর্বর সময়। তবে যাঁরা সন্তান চান না, তাঁদের এটিও জেনে রাখা দরকার যে, এই ডিম্বকোষ নির্গমনের (ovulationএর) দিনটি প্রচন্ড পাল্টায়। তাই এর সঙ্গে আগে ও পরে আরো দু'একদিন যোগ করা ভাল। তবু মাসিক ঋতুচক্রের ৯ম দিনের আগের ও ২০শ দিনের পরেকার সময়কে মোটামুটি নিরাপদ সময় বলে ধরা যায়। এই সময় যৌনমিলন ঘটলে তার থেকে সন্তান ধারণের তথা গর্ভবতী হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না, কারণ এই সময় ডিম্বকোষ বেরোয়ই না। কিন্তু বিরল হলেও এটিও দেখা গেছে যে, মাসিক চক্রের যে কোনওদিন (তথাকথিত ঐ নিরাপদ সময়ের দিনগুলিসহ) মাত্র একবারের যৌনমিলনেও নারী গর্ভবতী হতে পারে অর্থাৎ বিরল ক্ষেত্রে মাসিক চক্রের যে কোন সময়ই ডিম্বকোষ বেরুতে পারে। তাই এই হিসেবে তথাকথিত নিরাপদ সময় বলে কিছু নেই। তবে এটি নেহাৎই ব্যতিক্রম। সাধারণভাবে ৯ম দিনের আগে ও ২০ শ দিনের পরের সময়টি নিরাপদ সময় এবং ৯ম-২০শ দিনের মধ্যকার সময়টিকে উর্বর সময় হিসেবে ধরা যায়, আর এর মধ্যেও দ্বাদশ থেকে ষোড়শ দিনটি উর্বরতম সময়।

অবাঞ্ছিত গর্ভ আটকাতে নতুন ওষুধ

কোনও সতর্কতা না দিয়ে যদি যৌনমিলন ঘটে যায় এবং এর ফলে গর্ভবতী হওয়ার ব্যাপারটিকে যদি আটকানোর ইচ্ছে থাকে, তবে ঐ যৌন মিলনের পাঁচদিনের মধ্যে লিভোনরজেস্ট্রেল (Levonorgestrel) বা e-pill নামক হরমোনঘটিত ওষুধটি খাওয়া যেতে পারে। ০.৭৫ মিলিগ্রামের দু'টি ট্যাবলেট একসঙ্গে খেতে হবে। দাম প্রায় ৩০ টাকা। এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া প্রায় নেই। এটি গর্ভমোচন (abortion) করায় না, গর্ভাধানকেই প্রতিহত করে। সরকারি সিদ্ধান্ত অনুযায়ি ভারতে শিঘ্রই এটি সব ওষুধ দোকানে খোলাভাবে কিনতে পাওয়া যাবে। বাণিজ্যিক নাম ইসি-২, পিল-৭২, ই-পিল নবলোভা ইত্যাদি।

সংক্ষেপে পুংহরমোন টেস্টোস্টেরনের প্রভাব

- ত্বকে আঠালো সেবাম নিঃসরণ
- মুখে, কানে, গায়ে লোম গজানো
- মাথায় টাক পড়া
- লিঙ্গ ও অন্ডাশয়ের বিকাশ
- প্রস্টেট গ্ল্যান্ডের বিকাশ ও কার্যকারিতা
- ল্যারিংক্স (স্বরযন্ত্র)-এর বৃদ্ধি
- মাংসপেশীর শক্তি বৃদ্ধি
- হাড়ের বিপাকীয় ক্রিয়া ও অস্থিপ্রান্তের সংযোগ (epiphyseal closure)
- যৌন আকাঙ্ক্ষা
- আক্রমণ মুখিতা

সংক্ষেপে স্ত্রী হরমোনের প্রভাব

ইস্ট্রাডায়ল

- জরায়ুর অন্তরাবরণীর বৃদ্ধি
- যৌনাঙ্গের বিকাশ ও যোনিপথের সিক্ততা
- স্তনের বিকাশ
- অস্থিপ্রান্তের সংযোগ ও অস্থির বিকাশ
- মস্তিষ্কের গঠন
- শরীরে চর্বির বিশেষ বিস্তার
- ত্বকে সেবাম নিঃসরণ
- যৌন আকাঙ্ক্ষা

প্রজেস্টেরোন

- জরায়ুর অন্তরাবরণীর বিশেষ পরিবর্তন
- জরায়ুর মাংসপেশীর সংকোচন ক্ষমতার বৃদ্ধি
- শরীরে তাপ সৃষ্টি
- স্তন বৃদ্ধি

(৫)
যৌন মিলনের কথা

আমরা সবাই আমাদের বাবা-মায়ের সফল যৌনমিলনের ফসল। সম্প্রতি অবশ্য যৌনমিলন ছাড়াও সন্তানের জন্ম হচ্ছে। কিন্তু এই সব নলজাতক (test tube baby) বা কৃত্রিম বীর্যপ্রয়োগ (artificial insemination) পদ্ধতির ফসল ঐ শিশুর সংখ্যা অতি কম এবং তুলনামূলকভাবে নগণ্য। আর ব্যাপারটি স্বাভাবিক তথা প্রাকৃতিক তো নয়ই।

প্রতিটি প্রাণীই কোন না কোনভাবে প্রজনন করে, পৃথিবীতে রেখে যায় তাদের উত্তরসূরী 'বংশ'ধরদের। সব প্রাণী অবশ্য মানুষের মত এমন বংশের হিসাব করে না। তবে তা অন্য প্রসঙ্গ। মানুষ আবার তাদের যৌনতা ও যৌনমিলনের মধ্যে বহু বৈচিত্র্য, আবেগ আর আনন্দের আমদানি করেছে। কিন্তু তা হলেও সন্তান উৎপাদনের জন্য বা মানসিক-শারীরিক তৃপ্তির জন্য নারী-পুরুষের মিলনের কয়েকটি সাধারণ দিক আছেই। সমকামী যৌনতা ছাড়া অন্য ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ উভয়েরই কমবেশি ভূমিকা যৌনমিলনে থাকে, যদিও সাধারণভাবে পুরুষের সক্রিয়তা তুলনামূলকভাবে নারীর চেয়ে কিছুটা বেশি।

পুরুষের ভূমিকা

সফল যৌনমিলনে পুরুষের ভূমিকার কয়েকটি প্রধান দিক রয়েছে,— (১) স্বাভাবিক যৌনইচ্ছা (intact libido), (২) লিঙ্গের উত্থান (penile erection) ঘটা ও তা ধরে রাখা, (৩) বীর্যপাত (ejaculation) ও তারপর (৪) লিঙ্গ নরম হয়ে যাওয়া (detumescence)। এদের কোনটির গন্ডগোল হলেই যৌনমিলন অসফল বা কষ্টকর হয়ে যেতে পারে।

(১) যৌন ইচ্ছার ব্যাপারটা শৈশবেই ধীরে ধীরে শুরু হয়। বয়ঃসন্ধির পর তা বিশেষ মাত্রা পায় এবং বিপরীত লিঙ্গের সঙ্গে মানসিক-শারীরিক ভাবে সংযুক্ত হওয়ার আকাঙ্ক্ষায় পরিণত হয়। শৈশব থেকে সংগৃহীত নানাবিধ অভিজ্ঞতার সঙ্গে শারীরিক হরমোনের প্রভাব এক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করে। দর্শন, স্পর্শ, ঘ্রাণ, শ্রবণ, কল্পনা ও হরমোন—এসবগুলিই যৌনইচ্ছাকে প্রভাবিত করে। পুং হরমোন টেস্টোস্টেরন যৌনইচ্ছার বৃদ্ধি ঘটায়। তবে বেশি মাত্রায় কৃত্রিমভাবে প্রয়োগ করলে বিকৃত ও অসুস্থ তীব্র যৌন আকাঙ্খা সৃষ্টি হতে পারে। হরমোনগত গন্ডগোল ও মানসিক কারণে যৌনইচ্ছা কমে যেতে পারে। ছোটবেলা থেকেই যদি যৌনতাকে অন্যায়, পাপ, খারাপ কাজ বা অপরাধ বলে কারোর মনের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়, তবে বয়ঃসন্ধির পরও কোন যুবকের যৌনইচ্ছা অস্বাভাবিকভাবে কমে যেতে পারে।

(২)সফল যৌনমিলনের জন্য লিঙ্গের উত্থান তথা শক্ত হওয়ার ব্যাপারটি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। নরম লিঙ্গ নারীর যোনিতে প্রবেশ করবে না, ফলে জরায়ুমুখে বীর্যপাতও ঘটবে না, জরায়ু পাবে না শুক্রকোষ যা নারীর ডিম্বকোষের সঙ্গে মিলিত হয়ে জন্ম দেবে শিশুর আর যে শিশুর জন্যই প্রকৃতি এত কোটি বছরের বিবর্তনে নারীপুরুষের শরীরকে এমন সাজিয়ে গুছিয়ে উপযোগী করে তুলেছে।

লিঙ্গের এই শক্ত হওয়ার ব্যাপারটি ঘটে নিছক লিঙ্গের মধ্যে রক্ত জমার কারণেই। আগেই বলা হয়েছে পুরুষের লিঙ্গের মধ্যে লম্বা দন্ডের মত তিনটি মাংসল কর্পাস (corpus; বহুবচনে corpora) থাকে। উপরের দিকে পাশাপাশি থাকে দু'টি কর্পোরা ক্যাভার্নোসা এবং নীচের দিকে থাকে একটি কর্পাস স্পঞ্জিয়োসাম যা ঘিরে রাখে মূত্রনালীকে। এগুলি অনৈচ্ছিক মাংসপেশী দিয়ে গঠিত এবং তার মধ্যে থাকে অসংখ্য রক্তবহানালিকার জাল। এই কর্পোরাগুলি আবৃত থাকে টিউনিকা অ্যালবুজিনিয়া নামক তুলনামূলকভাবে শক্ত ও স্থিতিস্থাপক (fibroelastic) আবরণের দ্বারা।

যৌনইচ্ছা জাগার পর শ্রবণ, দর্শন, স্পর্শ, কল্পনা ইত্যাদির সাহায্যে যৌন উত্তেজনা ঘটে। এই উত্তেজনা আসলে কেন্দ্রীয়ভাবে মস্তিষ্কের নিয়ন্ত্রণে স্নায়বিক উত্তেজনা। লিঙ্গের চামড়ায় থাকা স্পর্শগ্রাহক নার্ভগুলি পুডেন্ডাল নার্ভ (pudendal nerve) দিয়ে সুষুম্নাকান্ড বা স্পাইনাল কর্ডের ২য়,৩য় ও ৪র্থ স্যাক্রাল খন্ডে যায়। স্পাইনাল কর্ডের একই খন্ডগুলি থেকে প্যারাসিমপ্যাথেটিক নার্ভও যায় লিঙ্গে। আর সিমপ্যাথেটিক নার্ভ আসে স্পাইনাল কর্ডের ১১ শ ও ১২ শ থোরাসিক খন্ড এবং ১ম ও ২য় লাম্বার খন্ড থেকে। লিঙ্গের উত্থানের জন্য এইসব নার্ভের ভূমিকা থাকে। তাই এই সব নার্ভের তথা স্পাইনাল কর্ডের ঐসব খন্ডের রোগ হলে লিঙ্গের শক্ত হওয়ার ব্যাপারটা বিপর্যস্ত হয়।

স্নায়বিক উত্তেজনার কারণে লিঙ্গের অনৈচ্ছিক মাংসপেশীর কোষে জটিল জৈবরাসায়নিক প্রক্রিয়া শুরু হয়। নাইট্রিক অক্সাইড সিনথেজ নামক উৎসেচকের সাহায্যে এল-আর্জিনিন (L-arginine) থেকে তৈরি হয় নাইট্রিক অক্সাইড (NO)। এই নাইট্রিক অক্সাইড লিঙ্গের অনৈচ্ছিক মাংসপেশীর উপর সক্রিয় হয়, কোষে সাইক্লিক জি এম পি (cyclic GMP বা cyclic 3′5′, guanosine monophosphate)-র উৎপাদন বৃদ্ধি ঘটায়, যা আবার-'প্রোটিন কাইনেজ জি'-এর সঙ্গে ক্রিয়া করে এবং কোষের মধ্যকার ক্যালসিয়ামের পরিমাণও কমিয়ে দেয়। আর এর ফলেই ঘটে লিঙ্গের ঐ কর্পোরাগুলির অনৈচ্ছিক মাংসপেশীর এবং তার ভেতরে থাকা রক্তবহানালিকারও প্রসারণ। এর ফলে এইসব নালিকার মধ্যে রক্ত জমা হয়। কিন্তু অনৈচ্ছিক ঐ মাংসপেশী প্রসারিত হয়ে কর্পোরার চারপাশে থাকা তুলনামূলক ভাবে শক্ত আবরণীর (টিউনিকা অ্যালবুজিনিয়া) উপর চাপ দেয়। এর ফলে যে শিরা (vein) দিয়ে রক্ত ফিরে যাওয়ার কথা তা বন্ধ হয়ে যায়। লিঙ্গের মধ্যে অর্থাৎ তার মাংসপেশীর মধ্যে রক্ত জমতেই থাকে। আর এইভাবেই মুখবন্ধ, জলভরা, সরু, লম্বা বেলুনের মত লিঙ্গ শক্ত হয়ে যায় তথা তার উত্থান ঘটে।

যৌন উত্তেজনা তথা নার্ভের উত্তেজনা প্রশমিত হলে (অর্থাৎ বীর্যপাতের পর), ঐ সাইক্লিক জি এম পি (cyclic GMP) ধীরে ধীরে শরীর কোষেই থাকা ফসফোডাই এস্টারেজ টাইপ-5 (PDE-5) নামক উৎসেচকের দ্বারা ভেঙ্গে যায়। সাইক্লিক জি এম পি র-পরিমাণ কমার কারণে কোষের ভেতরে ক্যালসিয়ামের পরিমাণ আবার বাড়তে থাকে। ফলে কোষগুলি আর প্রসারিত থাকে না, ধীরে ধীরে পূর্বাবস্থায় ফিরে আসে। শিরাগুলিও খুলে যায়। উচ্ছিত লিঙ্গের মধ্যে জমে থাকা রক্ত চলে যায়। লিঙ্গ নরম হয়ে (detumescence)। কিন্তু এ ব্যাপারটি ঘটে পরে, বীর্যপাত (ejaculation) হয়ে যাওয়ার পর। আর শুধু নাইট্রিক অক্সাইড নয়, স্থানীয় কোষে রক্তবহানালিকার উপর ক্রিয়াশীল প্রাস্টাগ্ল্যান্ডিন (PGE$_1$ ও PGF$_2$) তৈরি হয়। এগুলি সাইক্লিক এডেনোসিন মনোসফেট (cyclic AMP)-এর পরিমাণ বৃদ্ধি ঘটায়। এর ফলেও লিঙ্গ মধ্যস্থ অনৈচ্ছিক মাংসপেশীর প্রসারণ তথা রক্ত সঞ্চালন ঘটে অর্থাৎ লিঙ্গের শক্ত হওয়ার পেছনে এদেরও কিছু ভূমিকা থাকে।

(৩) যৌনমিলনের চরম পর্যায়ে ঘটে বীর্যপাত (ejaculation) যার পেছনে সিমপ্যাথেটিক নার্ভ ভূমিকা পালন করে। ফলশ্রুতিতে এপিডিডিমিস, ভাস ডেফারেন্স, সেমিনাল ভেসিকল (বীর্যথলি) ও প্রস্টেট গ্ল্যান্ডের সংকোচন ঘটে। এর ফলে প্রস্টেট গ্ল্যান্ডের জলীয় ক্ষরণের সঙ্গে শুক্রকোষ সমৃদ্ধ বীর্য মিশ্রিত হয়ে মূত্রনালীতে নির্গত হয়। লিঙ্গের মাংসপেশী তখন পর্যায়ক্রমে ছন্দোবদ্ধ সংকোচনের দ্বারা মূত্রনালীর মুখ দিয়ে বীর্যকে লিঙ্গের বাইরে বের করে দেয়, —নারীর সঙ্গে যৌনমিলনের সময় যা পড়ে যোনিপথের উপরের দিকে থাকা জরায়ুমুখে (cervix-এ)। যৌনমিলনে বীর্যপাত হওয়ার জন্য কিছুটা সময় অতিবাহিত হওয়া প্রয়োজন। মিলনের সময় যোনির সঙ্গে লিঙ্গমুন্ডের ঘর্ষণে নারী-পুরুষ উভয়েরই যৌনতৃপ্তি হতে থাকে অর্থাৎ সংশ্লিষ্ট নার্ভের উত্তেজনা ঘটতে থাকে। এটিই বাড়তে বাড়তে একসময় চরমতম অবস্থায় পৌঁছয়। এই সময় উভয়েরই চরম যৌনতৃপ্তি (orgam) অনুভব করার কথা। আদর্শ বা সফল যৌনমিলনে দু'জনেরই তা হওয়া উচিত। কিন্তু প্রায়ই যা হয় নারীর চরম তৃপ্তি হওয়ার আগে পুরুষের ক্ষেত্রে তা ঘটে। আর পুরুষের এই তৃপ্তি চরম অবস্থায় পৌঁছনর অর্থ সংশ্লিষ্ট সিমপ্যাথেটিক নার্ভের সর্বাধিক উত্তেজনা, যার ফলে এপিডিডিমিস থেকে প্রস্টেট গ্রন্থির সংকোচন তথা বীর্যপাত ঘটে যায়।

কিন্তু কোন কোন সময় এই বীর্যপাত খুব তাড়াতাড়ি পুরুষের প্রকৃত যৌনতৃপ্তি হওয়ার অনেক আগেই হয়ে যেতে পারে (premature ejaculation)। লিঙ্গ যোনিমধ্যে প্রবেশ করানো হল কি হল না তার কোন ঠিক নেই,— কিন্তু ঐ বীর্যথলি, এপিডিডিমিস ইত্যাদি অস্থির হয়ে কুঁকড়ে মুকড়ে (অর্থাৎ সংকুচিত হয়ে) বীর্য বের করে দিয়ে একাকার কান্ড। এর ফলে পুরুষের তো বটেই, নারীরও সামান্যতম যৌন তৃপ্তি ঘটে না। মাঝখান থেকে লাভ হয় একরাশ বিরক্তি ও হতাশা। প্রায়শই এটি ঘটে মানসিক উদ্বেগ, যৌনক্রিয়া সম্পর্কে

অজ্ঞতা জনিত তাড়াহুড়ো করা ইত্যাদির কারণে। উপযুক্ত মনোচিকিৎসায় তা ঠিক করা যায়। প্রয়োজনে বিশেষ একধরনের ওষুধও দেওয়া হয় (selective serotonin reuptake inhibitors; SSRI)।

বিরল কোন কোন ক্ষেত্রে আবার বীর্য লিঙ্গমুখ দিয়ে বাইরে না বেরিয়ে উল্টোদিকে চলে যায় (retrograde ejaculation)। বীর্যপাতের সময় মূত্রনালির উপরের পথটি (internal urethral sphincter) বন্ধ না হওয়ার কারণে এটি ঘটে। ডায়াবিটিস মেলাইটাসের অনেক রোগীর ক্ষেত্রে এবং মূত্রনালির মুখের কাছে অস্ত্রোপচারের পর এ ব্যাপারটি ঘটতে পারে।

(৪) বীর্যপাত হয়ে যাওয়ার পর লিঙ্গ আস্তে আস্তে নরম ও ছোট হয়ে যায় (detumescence)। এক্ষেত্রেও ভূমিকা রাখে সিমপ্যাথেটিক নার্ভ, যার প্রভাবে বেরোয় নর এপিনেফ্রিন। এছাড়া রক্তবহানালিকার অভ্যন্তরীণ আবরণীর কোষ থেকে বেরোয় এন্ডোথেলিন (endothelin) নামে আরেকটি রাসায়নিক পদার্থ। এদের জন্য লিঙ্গের মাংসপেশীর অনৈচ্ছিক পেশীর সংকোচন ঘটে এবং উত্থিত লিঙ্গের মধ্যে জমা থাকা রক্ত লিঙ্গ থেকে বেরিয়ে যায়। ধীরে ধীরে লিঙ্গ নরম ও স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে। বেশ কিছুক্ষণ যৌন মিলনের পরে সিমপ্যাথেটিক নার্ভের উত্তেজনা ঘটতে ঘটতে একটি পর্যায়ে বীর্যপাত হওয়ার পরই সিমপ্যাথেটিক নার্ভের এই ভূমিকা কার্যকরী হয়। কিন্তু যদি কোন কারণে বেশ আগেই লিঙ্গ মধ্যস্থ শিরা থেকে রক্ত বেরিয়ে যায় (venous leak), তাহলে সফল তৃপ্তিদায়ক যৌনমিলনের বেশ আগেই লিঙ্গ নরম হয়ে যায় (premature detumescence)। মনে করা হয় কোন শারীরিক ত্রুটির জন্য নয়— এটি মূলত ঘটে লিঙ্গের মাংসপেশীর প্রসারণ ঠিক মতো না হওয়ার কারণে (যে কারণে রক্ত জমতে পারে না)।

অন্যদিকে কোন কোন সময় লিঙ্গ এইভাবে আর নরম হতে চায় না। দীর্ঘক্ষণ অস্বাভাবিকভাবে শক্ত হয়ে থাকে, যা বেশ যন্ত্রণাদায়ক। এই অবস্থার নাম প্রায়াপিজম (priapism)। রক্ত বেশি জমাট বাধার রোগ থাকলে, সুষুম্না কান্ডে আঘাত লাগার পর, সিকল সেল অ্যানিমিয়া হলে কিংবা লিঙ্গে রক্তবহানালিকা প্রসারণকারি ওষুধ ইনজেকশান করা হলে এই ধরনের কষ্টকর ও অপ্রীতিকর অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে।

নারীর ভূমিকা

যৌনমিলনে নারীর ভূমিকা পুরুষের মত এত সক্রিয় না হলেও যতটা ভাবা হয় ততটা নিষ্ক্রিয় আদৌ নয়। প্রথমত দরকার যৌন উত্তেজনা (sexual arousal)। নারীর বহির্যৌনাঙ্গের উপরের দিকে মধ্যরেখায় থাকা ক্ষুদ্র মাংসল অঙ্গ ভগাঙ্কুর বা ক্লাইটোরিস (clitoris) নারীর যৌন উত্তেজনা সৃষ্টি ও চরম আনন্দলাভ করার ক্ষেত্রে অতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং-সংশ্লিষ্ট মহিলার মানসিক (তথা শারীরিকও) সুস্থতা রক্ষার জন্য

প্রয়োজনীয়। এটি দু'এক মিলিমিটার থেকে দুই সেন্টিমিটার পর্যন্ত দীর্ঘ হতে পারে। এটি পুরুষের লিঙ্গেরই এক ধরনের পরিবর্তিত রূপ (homolog) এবং অত্যন্ত সংবেদনশীল। এতেও পুরুষের লিঙ্গের মত কর্পোরাগুলি থাকে, কিন্তু মূত্রনালিকা থাকে না। প্রকৃত যৌনমিলনের আগে পুরুষের হাতে ক্লাইটোরিসের মৃদু ঘর্ষণ যৌন উত্তেজনা সৃষ্টি করতে তথা যৌনমিলনের জন্য নারীকে প্রস্তুত করতে সাহায্য করে। স্পর্শ (তথাকথিত আদর), দর্শন, শ্রবণ, এমনকি বিশেষ কিছুর ঘ্রাণও নারীদের যৌন উত্তেজনা ঘটাতে পারে। এর ফলে যোনির অভ্যন্তরীণ আবরণীর রক্ত বহানালিকায় রক্ত সঞ্চালন বাড়ে এবং যোনির মধ্যে জলীয় পদার্থের ক্ষরণ ঘটে। এর ফলে যোনি পথ পিচ্ছিল হয়ে যায় এবং পুরুষের উত্থিত লিঙ্গ প্রবেশ করতে পারে। সফল ও তৃপ্তিদায়ক যৌন মিলনের জন্য এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যৌনমিলনের প্রতি ভীতি, স্পর্শ-শ্রবণ ইত্যাদির মধ্য দিয়ে উপযুক্ত যৌন উত্তেজনা না ঘটা, বেশি বয়স, যোনিপথের কোন রোগ বা অস্বাভাবিকত্ব ইত্যাদি নানা কারণে যোনিপথের এই পিচ্ছিল রসসিক্ত অবস্থা না আসতে পারে। এর ফলে লিঙ্গ প্রবেশ করানোর ব্যাপারটি উভয়ের পক্ষে কষ্টকর হয় এবং যৌনমিলন আনন্দদায়ক না হয়ে যন্ত্রণাদায়ক (dyspareunia) হয়ে ওঠে।

যৌনমিলনে নারীর পরবর্তী স্তর হচ্ছে চরমতম যৌন তৃপ্তি (orgasm)। এই সময় নারীর অভ্যন্তরীণ যৌনাঙ্গের তথা বস্তি প্রদেশ (pelvis)-এর মাংসপেশীর অনৈচ্ছিক সংকোচন-প্রসারণ ঘটে। এটি মস্তিষ্কের আনন্দের অনুভূতি জাগায় এবং চরম যৌনতৃপ্তির অনুভূতি দেয়। ক্লাইটোরিস-এর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ উত্তেজনা এই যৌনতৃপ্তির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যৌনমিলনের সময় পুরুষের লিঙ্গের গোড়ার অংশটি দ্বারা ক্লাইটোরিসের উপর চাপ ও ঘর্ষণ আনন্দ দায়ক।* তৃপ্তিদায়ক যৌনমিলনের জন্য তা প্রয়োজনীয় ভূমিকা পালন করে। নারীর মানসিক সুস্থিতি ও স্বাভাবিকত্ব রক্ষায় এই তৃপ্তির অসামান্য ভূমিকা রয়েছে।

*মেয়েদের এই আনন্দদায়ক যৌনমিলন থেকে বঞ্চিত করার উদ্দেশ্যে পৃথিবীর বহু দেশে (বিশেষত আফ্রিকায় ও ইয়োরোপে) অনেক মুসলিম, খৃষ্টান ও কিছু আদিবাসী গোষ্ঠীর কিশোরীদের ক্লাইটোরিস কেটে দেওয়া হয় (clitorectomy)। এটি **মেয়েদের সুন্নৎ করার মত** যেমন ছেলেদের লিঙ্গমুণ্ড আবরণী বা (prepuce) কেটে সুন্নৎ বা (circumcision) করা হয়। একটি প্রাথমিক সমীক্ষায় দেখা গেছে বর্তমানে পৃথিবীতে প্রতি বছর অন্তত দেড় কোটি মেয়েদের এইভাবে সুন্নৎ করা হয়ে থাকে। কি ছেলেদের, কি মেয়েদের কারোর ক্ষেত্রেই ধর্মীয় প্রথা হিসেবে সুন্নৎ করাটা অর্থহীন ও হাস্যকর। তবে ছেলেদের ফাইমোসিস থাকলে চিকিৎসার স্বার্থে তা করার দরকার হয়। আর পুরুষদের ক্ষেত্রে সুন্নৎ করার সামান্য কিছু ইতিবাচক দিক থাকলেও (যেমন স্মেগমা না জমতে দেওয়া), মেয়েদের ক্ষেত্রে তা সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয় ও নেতিবাচক একটি প্রক্রিয়া। এর মধ্যে কোন ইতিবাচক দিকই নেই। যৌনমিলনে মেয়েরা যাতে কোন তৃপ্তি ও আনন্দ না পায় এবং এর ফলে যৌন মিলনের প্রতি যাতে তাদের আগ্রহ না থাকে (আর এইভাবে 'সতীত্ব' বজায় রাখে),—সম্পূর্ণ এই উদ্দেশ্যেই মেয়েদের এইভাবে 'সুন্নৎ' করা হয়। ক্লাইটোরিস কাটার সময় বহু মেয়ে অতিরিক্ত রক্তপাত ও জীবাণু সংক্রমণের জন্য মারাও যায়। মেয়েদের সুন্নৎ করাটা পুরুষদের দ্বারা নারী-অবদমনের একটি বীভৎস হাতিয়ার।

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পুরুষের তাড়াহুড়ো করা, শুধুমাত্র নিজের যৌনতৃপ্তি পাওয়ার চেষ্টা (ধান্দা!) তথা স্বার্থপরতা, আধিপত্য, একপেশে আচরণ ও আত্মকেন্দ্রিকতা ইত্যাদি কারণে মেয়েরা যৌনমিলনে এই ধরনের তৃপ্তিলাভ করে না। এর ফলে গর্ভবতী হওয়া আটকায় না (যে কারণে ধর্ষিতা নারীও গর্ভবতী হন), কিন্তু যৌন জীবনে দিনের পর দিন যৌন অতৃপ্তি স্থায়ি মানসিক, এমনকি শারীরিক বৈকল্যেরও সৃষ্টি করতে পারে (যেমন খিটখিটে মেজাজ, পেপটিক আলসার, কোলাইটিস, উচ্চরক্তচাপ, হৃদরোগ, ক্রমশ রুগ্ন হয়ে যাওয়া, অবসাদবোধ ও ক্লান্তি ইত্যাদি ইত্যাদি)।

যৌনমিলনে নারীর অস্বাভাবিকত্ব

প্রথমত ঘটতে পারে অসম্পূর্ণ যৌন উত্তেজনা। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এটি ঘটে পুরুষসঙ্গীর দিক থেকে উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ না করার কারণে। মিলনের আগে চুম্বন ও শরীরের বিশেষ কিছু স্থানে (বিশেষত ক্লাইটোরিস-এ) স্পর্শ বা মর্দন, বিশেষ ধরনের কথাবার্তা বলা বা তথাকথিত প্রেমালাপ ইত্যাদির ফলে যে স্নায়বিক উত্তেজনা ঘটে সেটি নারীর যৌন উত্তেজনা জাগায়। কিন্তু কখনো কখনো দেখা যায় পুরুষসঙ্গী এই ধরনের প্রয়োজনীয় কর্মকান্ড গ্রহণ করেও নারীর যৌন উত্তেজনা আশানুরূপ ঘটছে না। এক্ষেত্রে স্থানীয় নার্ভের বিভিন্ন ধরনের রোগ বা অস্বাভাবিকত্ব ভূমিকা পালন করে।

যেমন ডায়াবিটিস মেলাইটাস বা মাল্টিপল্ সাক্লেরোসিসের মত রোগে এই ধরনের স্নায়বিক বৈকল্য তথা অসম্পূর্ণ যৌন উত্তেজনা ঘটতে পারে। এছাড়া ছোটবেলায় বা পূর্বেকার যন্ত্রণাদায়ক যৌনমিলনের অপ্রীতিকর স্মৃতি, যৌন নিপীড়ন ও অত্যাচার, অবাঞ্ছিত গর্ভ ইত্যাদির কারণে যৌন মিলনের প্রতি বদ্ধমূল ভীতি থাকতে পারে। এর ফলেও স্বাভাবিক যৌন উত্তেজনা সৃষ্টি নাও হতে পারে। যোনিপ্রদাহ, ডিম্বাশয়ের প্রদাহ, এন্ডোমেট্রিওসিস-এর মতো রোগ তথা নারীর যৌনাঙ্গের নানা রোগ ও ব্যথার কারণেও যৌনমিলন যন্ত্রণাদায়ক হয়ে ওঠে। এইভাবে এগুলিও সুস্থ যৌন উত্তেজনা সৃষ্টির পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। শারীরিক দুর্বলতা, ক্যান্সার বা হৃদরোগের মত রোগও পরোক্ষভাবে স্বাভাবিক যৌন উত্তেজনা সৃষ্টিতে বাধা দেয়।

তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এটি ঘটে মানসিক কারণে। এর মধ্যে পূর্বোক্ত নিপীড়ন ও যন্ত্রণাদায়ক অভিজ্ঞতা যেমন একটি, তেমনি অন্যতম আরেকটি হল যৌনমিলন সম্পর্কিত ভুল ধারণা ও অসুস্থ মূল্যবোধ। বিশেষত অনেক রক্ষণশীল, সংস্কারাচ্ছন্ন পরিবারে ও পরিবেশেই যৌন মিলনকে খারাপ কাজ এমনকি অন্যায়, অনৈতিক হিসেবেও মেয়েদের মনে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। ফলে পরবর্তীকালে যৌনমিলনের সময় এক ধরনের ভ্রান্ত অপরাধবোধ কাজ করে। এর ফলে নারী-পুরুষ উভয়েরই যৌন জীবন অসুস্থ ও আনন্দহীন হয়ে ওঠে। সৃষ্টি হয় নানা ধরনের শারীরিক, মানসিক, পারিবারিক ও সামাজিক অস্বাভাবিকত্ব। স্তন ছোট হলে, স্তনে অস্ত্রোপচার করা হয়ে থাকলে, কোন রোগের কারণে

স্তন বা জরায়ু কেটে বাদ দেওয়া হয়ে থাকলে অনেক মহিলাই এক ধরনের মিথ্যা হীনমন্যতায় ভোগেন —সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী, সঙ্গিনীর শুধু শরীরকেই গুরুত্ব দেওয়া বা অজ্ঞতার কারণে কোন কোন সময় তাঁর পুরুষসঙ্গীও সঙ্গিনীর মধ্যে তা আরোপ করেন বা আচার-আচরণের মধ্যে তার প্রকাশ ঘটান। এর ফলেও সংশ্লিষ্ট মহিলা উপযুক্ত যৌন উত্তেজনার অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারেন না। এছাড়া হতাশা, উদ্বেগ, ক্লান্তি, পুরুষসঙ্গীর সঙ্গে বোঝাপড়া (প্রেম!)-এর অভাব, দাম্পত্য কলহ ইত্যাদির জন্যও যোনিপথের রক্তবহানালিকায় রক্ত সঞ্চালন বৃদ্ধি ও যোনিপথের রসসিক্ত পিচ্ছিল অবস্থা তথা যৌন উত্তেজনা না ঘটতে পারে। যৌনউত্তেজনার ঘাটতির চিকিৎসা করতে হলে এ সব গুলিই মাথায় রাখতে হবে। যৌনাঙ্গের কোন রোগ থাকলে তার চিকিৎসা ওষুধপত্র (অ্যান্টিবায়োটিক, হরমোন ইত্যাদি) ও অন্যান্য আনুষাঙ্গিক ব্যবস্থাদির সাহায্যে সফলভাবে করা যায়। অন্যান্য মানসিক ব্যাপারগুলিও খুঁটিয়ে জেনে নেওয়া যায় এবং যথাসম্ভব অপনোদনের চেষ্টা করা যায়। আর এ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মহিলার পুরুষসঙ্গীর সহানুভূতি, সচেতনতা ও সহযোগিতা সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন।

চরম যৌনতৃপ্তি (orgasm)-এর অভিজ্ঞতা বহু নারীই পান না। এমনকি কেউ কেউ সারা জীবনেও তা না পেয়ে থাকতে পারেন। পুরুষ বীর্যপাতের সময়ই এই অভিজ্ঞতা লাভ করে। কিন্তু নারীর ক্ষেত্রে পূর্বোক্ত যৌন উত্তেজনা এবং একটি নির্দিষ্ট সময় ধরে যৌন মিলন,-এগুলি চরম তৃপ্তির জন্য গুরুত্বপূর্ণ। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উভয়ের এই তৃপ্তিলাভের ব্যাপারটি একই সময়ে, ছন্দোবদ্ধভাবে ঘটে না। নারীরা ব্যাপারটিকে অনেক সময়ই বিরাট গুরুত্ব দেন না। প্রেমিক বা স্বামীর শুধু স্পর্শ এবং তার সঙ্গকেই আনন্দদায়ক হিসেবে গ্রহণ করেন। কিন্তু অনেক মহিলার কাছে আবার চরম তৃপ্তির অভাবের ব্যাপারটি অত্যন্ত হতাশাজনক ও অ-সুখের কারণ হয়ে ওঠে।

এ ব্যাপারেও পুরুষসঙ্গীর একটি বড় ভূমিকা আছে। যৌনমিলনের আগে ও ঐ সময় ক্লাইটোরিসকে উপযুক্তভাবে উত্তেজিত করতে পারলে নারীর চরম তৃপ্তিলাভের ব্যাপারটি সহজতর হয় এবং যৌনমিলন উভয়ের কাছেই আনন্দদায়ক, তৃপ্তিকর ও সুস্থ ব্যাপার হয়ে ওঠে। এছাড়া বিশেষ কিছু কথাবার্তা ও অন্যান্য অঙ্গাদির স্পর্শ-মর্দন ইত্যাদিও এ ব্যাপারে ভূমিকা রাখতে পারে। পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট মহিলাকেও মানসিকভাবে প্রস্তুত হওয়া, অহেতুক ভীতি ও অনীহা দূর করা, প্রয়োজনে পুরুষসঙ্গীকে নির্দেশ দেওয়া ও সাহায্য করার উদ্যোগ নিতে হবে।

তীব্র যোনি সংকোচন (vaginismus) এক ধরনের বিশেষ অবস্থা, যা যৌনমিলনকে যন্ত্রণাদায়ক করে তুলতে পারে। এটি তুলনামূলক ভাবে বিরল ক্ষেত্রেই ঘটে। আগেকার কষ্টকর যন্ত্রণাদায়ক যৌনমিলনের অভিজ্ঞতা তথা যৌনমিলনের প্রতি প্রচন্ড ভীতি এ ক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা পালন করে। যোনিতে লিঙ্গের প্রবেশের মুখেই স্থানীয় মাংসপেশীর অনৈচ্ছিক ও যন্ত্রণাদায়ক সংকোচন ঘটে। ফলে যৌনমিলনই অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। মানসিক আশ্বাস,

মিলনের পূর্বে অন্যান্যভাবে যৌন উত্তেজনা সৃষ্টি করা, হাত দিয়ে যোনি মুখকে ধীরে ধীরে প্রসারিত করার চেষ্টা ইত্যাদির মাধ্যমে এটি দূর করা যায়। অবশ্যই এ ক্ষেত্রেও পুরুষসঙ্গীর ধৈর্য, সহানুভূতি ও সহমর্মিতা একান্তভাবেই প্রয়োজন।

সাম্প্রতিক কিছু গবেষণায় দেখা গেছে যৌনমিলনে নারীর চরম যৌনতৃপ্তি পাওয়ার বা না পাওয়ার পেছনেও জীন (gene) কিছু ভূমিকা পালন করে। সাধারণভাবে এই তৃপ্তি অধিকাংশ নারীই পান না, অনেকে তা সহজভাবেই নেন এবং এর পেছনে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কিছু দিক মূল ভূমিকা পালন করে। কিন্তু লন্ডনের সেন্ট টমাস হাসপাতালের 'টুইন রিসার্চ অ্যান্ড জেনেটিক এপিডেমিওলজি' (Twin Research & Genetic Epidemiology) বিভাগের গবেষক টিম স্পেকটর (Tim Spector)-য় এর নেতৃত্বে পরিচালিত একটি গবেষণা সম্প্রতি এটি দেখা গেছে যে আগে যতটা ভাবা হত মেয়েদের চরম যৌনতৃপ্তি (orgasm) না হওয়ার পেছনে নিছক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলই ততটা প্রধান ভূমিকা পালন করে না। ইংল্যান্ডের রয়াল সোসাইটির পত্রিকা 'বায়োলজি লেটার্স'-এর জুন ২০০৫, সংখ্যায় প্রকাশিত তাঁদের গবেষণাপত্র থেকে জানা যায় অভিন্ন যমজ (identical twin) মেয়েদের মধ্যে চরম যৌনতৃপ্তি পাওয়ার হার ভিন্ন যমজ (non-idential twin) মেয়েদের ক্ষেত্রের ঐ হারের চেয়ে অনেক বেশি। বাবা-মায়ের একটি করে শুক্রাণু (শুক্রকোষ;spermazoan) ও ডিম্বাণু (ডিম্বকোষ;ovum) নিষিক্ত হওয়ার পর দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যে যমজের জন্ম হয় তাদের অভিন্ন যমজ (identical twin) হিসেবে অভিহিত করা হয়। এদের জীনগত বৈশিষ্ট্য অভিন্ন অর্থাৎ এদের এক ধরনের ক্লোন (clone) হিসেবে অভিহিত করা যায়। এদের শারীরিক বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলীর মধ্যে হুবহু মিল থাকে, পরিবেশগতকারণে অতি সামান্য কিছু ভিন্নতা ছাড়া। অন্যদিকে বাবার দুটি ভিন্ন শুক্রকোষের সঙ্গে মায়ের দুটি ডিম্বকোষের মিলনে যদি যমজের জন্ম হয়, তবে তাদের ভিন্ন যমজ (non idential twin) হিসেবে অভিহিত করা হয়। এদের মধ্যে বড়জোর শতকরা ৫০ ভাগ জীন একই হয়, বাকিটা আলাদা। স্পষ্টতই এদের শারীরিক বৈশিষ্ট্য ও চরিত্রাবলীর মধ্যেও গরমিল থাকে অনেক। আর এসব কারণেই যদি কোন বৈশিষ্ট্য ভিন্ন যমজের মধ্যে থাকে, অথচ অভিন্ন যমজের মধ্যে না থাকে তবে তার পেছনে জীন-এর ভূমিকাও স্পষ্ট। আর মেয়েদের চরম যৌনতৃপ্তি পাওয়া বা না পাওয়ার পেছনে উপরোক্ত গবেষকরা তাই-ই দেখেছেন। প্রায় ৩৫০০ যমজ ও বয়স্ক মহিলাদের মধ্যে করা ঐ সমীক্ষায় দেখা গেছে, শতকরা ৩২ জন মহিলাই জানিয়েছেন তাঁরা যৌনমিলনের সময় চরম যৌনতৃপ্তি কখনোই পাননি বা পেলেও তা অতি বিরল। পাশাপাশি শতকরা ২১ জন মহিলা জানিয়েছেন তাঁরা হস্তমৈথুন করেও চরম যৌনতৃপ্তি কখনোই পাননি বা পেলেও তা খুব কম বা অতি বিরল সময়। অর্থাৎ মেয়েদের চরম যৌনতৃপ্তি পাওয়া-না-পাওয়ার ব্যাপারটি শুধুমাত্র যৌনমিলনের সময় পুরুষের আধিপত্যকামী, আগ্রাসী বা নেতিবাচক ভূমিকার জন্যই নয়, কিছু মহিলার শারীরিক বৈশিষ্ট্যই তাই, কারণ কিছু জন

নিজের মত করে হস্তমৈথুনেও এই তৃপ্তি পাননি। পাশাপাশি আরো উল্লেখযোগ্য হল, অভিন্ন যমজ মহিলাদের শতকরা ৩১ জন জানিয়েছেন তারা যৌনমিলনের সময় সবসময়েই বা প্রায়শই চরম যৌনতৃপ্তি পেয়ে থাকেন এবং শতকরা ৩৯ জন হস্তমৈথুন করে তা পেয়েছেন। অন্যদিকে ভিন্ন যমজ মহিলাদের ক্ষেত্রে এই হার যথাক্রমে শতকরা মাত্র ১০ ও ১৭ ভাগ। স্পষ্টতই এই পার্থক্যটি উল্লেখযোগ্য। আর এর ফলে এটিও স্পষ্ট যে নারীর চরম যৌনতৃপ্তি পাওয়ার ক্ষেত্রে জীন (gene)-এর একটি বড় ভূমিকা রয়েছে। পরিসংখ্যানগত ভাবে গবেষকরা এটিও দেখেছেন যে, শতকরা ৩৪-৪৫ ভাগ মহিলাদের চরম যৌনতৃপ্তির অভিজ্ঞতা পাওয়ার ক্ষমতা জীন গত বৈষম্য (genetic variation) -এর সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যায় এবং এ ক্ষেত্রে পরিবেশগত ভূমিকা নেই বা প্রায় শূন্য।

যৌনমিলনে পুরুষের অস্বাভাবিকত্ব

এ ক্ষেত্রে পুরুষের লিঙ্গ উপযুক্তভাবে শক্ত না হওয়া বা লিঙ্গ দৌর্বল্য (erectile dysfunction) প্রধানতম অস্বাভাবিকত্ব। বিভিন্ন বয়সের পুরুষের মধ্যে এই অস্বাভাবিকত্ব মোটেই বিরল নয়। আমেরিকায় ৪০ থেকে ৭০ বছর বয়সী পুরুষদের মধ্যে করা একটি সমীক্ষার (Massachusetts Male Aging Study) শতকরা ৫২ জনের মধ্যে বিভিন্ন মাত্রায় লিঙ্গ দৌর্বল্য ধরা পড়ে—এদের মধ্যে ১০ ভাগ পুরুষের লিঙ্গ একেবারেই শক্ত হয় না, ২৫ ভাগের ক্ষেত্রে মোটামুটি শক্ত হয় এবং বাকি ১৭ ভাগের মধ্যে অল্প মাত্রার দৌর্বল্য ছিল। ১৮-৫৯ বছর বয়সীদের মধ্যে করা আরেকটি জাতীয় সমীক্ষায় (National Health and Social Life Survey) শতকরা ১০ জন পুরুষ লিঙ্গের শক্তভাব ধরে রাখতে পারছেন না বলে দেখা গেছিল; এদের মধ্যে ৫০-৫৯ বছর বয়সে লিঙ্গ দৌর্বল্যে আক্রান্ত পুরুষের সংখ্যা ছিল সর্বাধিক (শতকরা ২১ ভাগ)। এছাড়া লিঙ্গ দৌর্বল্যে আক্রান্ত পুরুষের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি ছিল দরিদ্র (শতকরা ১৪ ভাগ), বিবাহ বিচ্ছিন্ন (১৪ ভাগ) ও অল্প শিক্ষিতপুরুষদের মধ্যে। এই হিসেবে লিঙ্গ দৌর্বল্য সবচেয়ে বেশি হওয়ার সঙ্গে এইদিকগুলি প্রধান ভূমিকা পালন করে—

বয়স
অর্থনৈতিক অবস্থা,
দাম্পত্য সম্পর্কের সুস্থতা,
শিক্ষা।

এছাড়া বিশেষ কিছু রোগও লিঙ্গ দৌর্বল্য সৃষ্টির পেছনে দায়ি থাকে, যেমন—

ডায়াবিটিস মেলাইটাস,
উচ্চরক্ত চাপ,
হৃদরোগ,
রক্তে হাইডেনসিটি লাইপোপ্রোটিন (HDL) কম থাকা,

কোমরে তথা সুষুম্না কান্ডের নীচের দিকে আঘাত,
প্রস্টেট ক্যান্সারে অস্ত্রোপচারের পর,
প্রস্টেট ক্যান্সার ইত্যাদির জন্য 'রে' দেওয়া (রেডিয়েশান থেরাপি),
হতাশা,
খিটখিটে মেজাজ।

অন্যদিকে চিকিৎসা বিজ্ঞানগত ভাবে এটি জানা আছে যে, লিঙ্গ দৌর্বল্য বয়োবৃদ্ধির স্বাভাবিক পরিণতি বা অংশ নয়। তবু বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে যে শারীরবৃত্তীয় ও মানসিক পরিবর্তন ঘটে তার সঙ্গে এটি সংশ্লিষ্ট। বেশি বয়সে নানা ধরনের ওষুধ ব্যবহারের প্রয়োজনও বাড়ে। বিশেষ কিছু ওষুধ কমবয়সী ব্যক্তিদেরও গ্রহণ করতে হয়। এই ধরনের বহু ওষুধও স্থায়ি বা সাময়িক লিঙ্গ দৌর্বল্যের কারণ হতে পারে, যেমন—

(১) থায়াজাইড, স্পাইর‍্যানোল্যাকটোনের মত মূত্রবর্ধক ওষুধ;

(২) উচ্চরক্তচাপের জন্য ব্যবহৃত বিশেষ কিছু ওষুধ যেমন, ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকারস, মিথাইল ডোপা, ক্লোনিডিন, রিসার্পিন, বিটা ব্লকারস, গুয়ানেথিডিন;

(৩) হৃদরোগ ও রক্তে লিপিডের উচ্চমাত্রা কমানোর ওষুধ যেমন, ডিগোক্সিন, জেমফিব্রোজিল, ক্লোফাইব্রেট;

(৪) হতাশাবিরোধী বিভিন্ন ওষুধ যেমন সিলেকটিভ সেরোটনিন রিআপটেক ইনহিবিটারস (SSRI—এর জন্য মূলত দ্রুত বীর্যপাত হয়ে যায়), ট্রাইসাইক্লিক অ্যান্টিডিপ্রেসান্টস, লিথিয়াম, মনোঅ্যামাইন অক্সিডেজ ইনহিবিটরস;

(৪) প্রশান্তিদায়ক ওষুধ যেমন বিউটিরোফেনন, ফেনোথায়াজিন;

(৫) অম্বলবিরোধী ওষুধ (এইচ- ২ অ্যান্টাগনিস্টস) যেমন র‍্যানিটিডিন, সাইমেটিডিন;

(৬) হরমোন—প্রজেস্টেরন, ইস্ট্রোজেন, স্টেরয়েড, আলফা রিডাকটেজ ইনহিবিটরস, জি এন-আর এইচ অ্যাগনিস্টস, সাইপ্রোটেরন অ্যাসিটেট;

(৭) ক্যান্সারের ওষুধ— সাইক্লোফসফামাইড, মেথোট্রেক্সেট, রোফেরন-এ;

(৮) অ্যান্টিকলিনার্জিক ওষুধ— ডাইসোপাইরামাইড, খিঁচুনি (কনভালশান) কমানোর ওষুধ;

(৯) নেশার ওষুধ— মদ (ইথানল), কোকেন, মারিজুয়ানা।

রোগজনিত লিঙ্গ দৌর্বল্যের শতকরা ৮০ ভাগের বেশিই ঘটে ডায়াবিটিস (মেলাইটাস), রক্তবহানালিকার স্থায়ি পরিবর্তন (অ্যাথেরোস্কলেরোসিস) ও পূর্বোক্ত বিভিন্ন ধরনের ওষুধ খাওয়ার জন্য এবং অতিরিক্ত ধুমপানের কারণে।

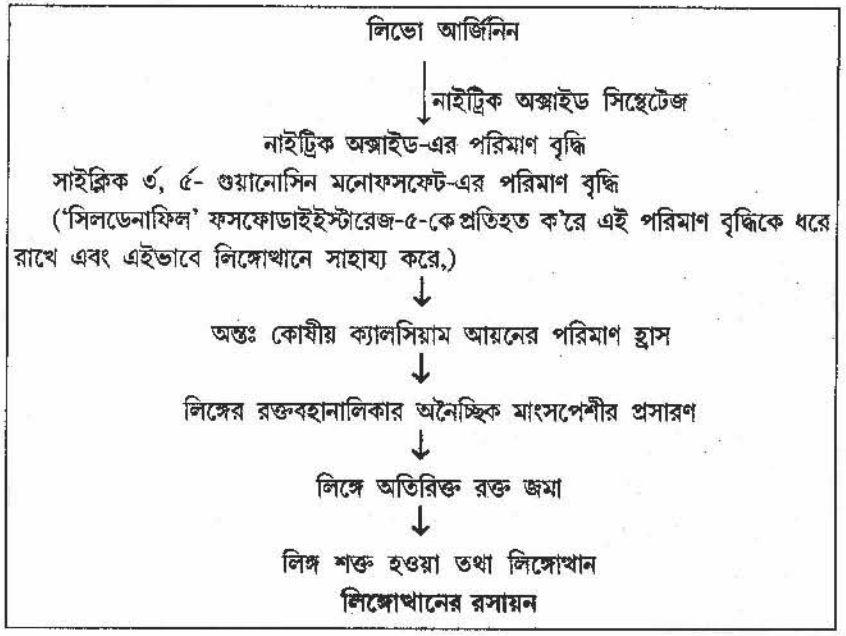

লিঙ্গ দৌর্বল্যের পেছনে তিনটি প্রক্রিয়া প্রাথমিকভাবে ভূমিকা রাখে—

(১) ব্যাপারটির শুরুতেই গন্ডগোল—মানসিক কারণে, হরমোনগত কারণে, নার্ভজনিত;

(২) লিঙ্গে রক্ত না জমতে পারা— ধমনী (artery)-র রোগের কারণে,

(৩) লিঙ্গের মধ্যে রক্ত বেশিক্ষণ ধরে রাখতে না পারা— শিরা (vein)-এর জন্য।

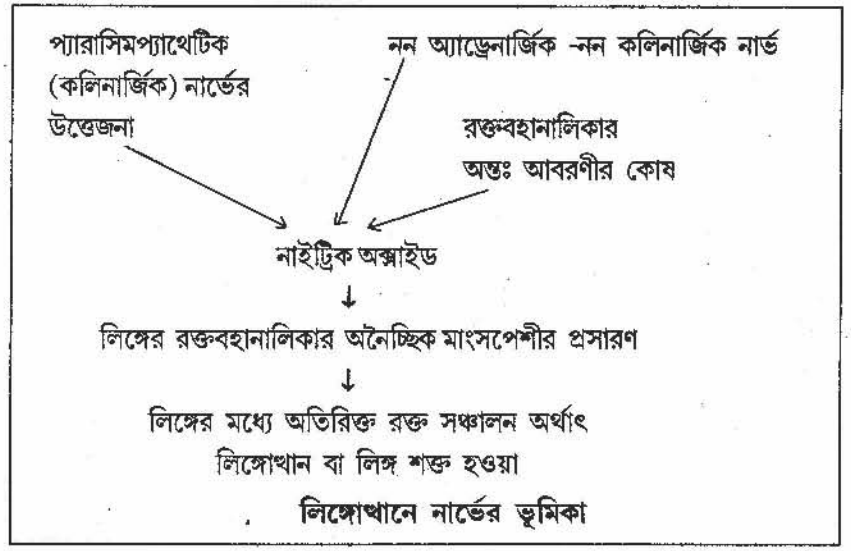

এই কারণগুলির কয়েকটিকে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করা যায়—,

(ক) রক্তবহানালিকা সংক্রান্ত— এই কারণেই সবচেয়ে বেশি লিঙ্গ দৌর্বল্য ঘটে। বয়সের জন্য অন্যভাবে রক্তবহানালিকা গাত্রের স্থায়ি পরিবর্তন (অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিস) ও আঘাতের কারণে লিঙ্গের মধ্যে রক্ত কম আসতে পারে। এর ফলে লিঙ্গ পুরো শক্ত হয় না এবং শক্ত হতে সময় বেশি লাগে। আবার রক্ত হয়তো যথেষ্ট এলো, কিন্তু শিরা দিয়ে রক্ত তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল— এ কারণেও লিঙ্গ ঠিকমত শক্ত হয় না বা শক্তভাব বেশিক্ষণ থাকে না। নিরন্তর উদ্বেগে ভোগা পুরুষদের মধ্যে সিমপ্যাথেটিক নার্ভ উত্তেজিত অবস্থায় থাকার কারণে এটি ঘটতে পারে। কোনভাবে প্যারোসিমপ্যাথেটিক নার্ভের কার্যকারিতা বিপর্যস্ত হলেও তা হতে পারে। বয়সের কারণে দেহকলার স্থিতিস্থাপকতা কমে যাওয়ারে কারণে ও রক্তে কলেস্টেরল বেশি হলেও লিঙ্গের মধ্যে রক্ত বেশিক্ষণ ধরে রাখা মুস্কিল হয়। এছাড়া অস্ত্রোপচার, আঘাত, রে দেওয়া (যেমন ক্যান্সারের চিকিৎসায়) ইত্যাদির জন্যও রক্ত ধরে রাখার তথা লিঙ্গোত্থানের বৈকল্য আসতে পারে।

(খ) নার্ভজনিত— সুষুম্না কান্ড (স্পাইনাল কর্ড)-এর নীচের (অর্থাৎ স্যাক্রাল) অংশের বা স্বয়ংক্রিয় (অটোনমিক) নার্ভের গন্ডগোলেও লিঙ্গ দৌর্বল্য দেখা দিতে পারে। এসবে আঘাত লাগলে, কোথায় কতটা আঘাত লেগেছে, তার উপর লিঙ্গ দৌর্বল্যের মাত্রা নির্ভর করে। মদ্যপান ও ডায়াবিটিস (মেলাইটাস)-এর কারণে নার্ভের রোগ (পেরিফেরাল নিউরোপ্যাথি) থেকেও এই ধরনের গন্ডগোল দেখা দেয়। অন্যদিকে মাল্টিপল স্ক্লেরোসিস- এও নার্ভের কর্মক্ষমতার বৈকল্য ঘটে।

(গ) হরমোনজনিত— পুংহরমোন অ্যান্ড্রোজেন যৌন ইচ্ছার জন্য গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু লিঙ্গোত্থানের ক্ষেত্রে তার ভূমিকা কতটা তা পরিষ্কার নয়। যে সব পুরুষের শরীরে অ্যান্ড্রোজেনের পরিমাণ কম, দেখা গেছে দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শ ইত্যাদির ফলে সৃষ্টি হওয়া যৌন উত্তেজনার পর তাদের লিঙ্গও যথেষ্ট শক্ত হয়। তবুও বিশেষত বয়স্কদের ক্ষেত্রে লিঙ্গোত্থানে অ্যান্ড্রোজেনের স্বাভাবিক পরিমাণ গুরুত্বপূর্ণ বলেই মনে হয়। শরীরে স্বাভাবিকভাবে যে পরিমাণ অ্যান্ড্রোজেন (টেস্টোস্টেরন) বেরোয় তার পরিমাণ কমে গেলে এবং এই কারণে লিঙ্গোত্থানে বৈকল্য ঘটলে তখন টেস্টোস্টেরন প্রয়োগ করে দেখা গেছে লিঙ্গোত্থান ঘটছে। কিন্তু শরীরের অভ্যন্তরীণ টেস্টোস্টেরন যদি স্বাভাবিক থাকে এবং অন্য কোন কারণে লিঙ্গ দৌর্বল্য ঘটে, তবে তখন বাইরে থেকে টেস্টোস্টেরন দিলেও লিঙ্গ দৌর্বল্য থেকে যায়। শরীরে প্রোল্যাকটিন হরমোনের পরিমাণ বৃদ্ধি পেলে, গোনাডোট্রফিক রিলিজিং হরমোন (জি এন-আর এইচ)-এর কাজ প্রতিহত হয়ে টেস্টোস্টেরনের পরিমাণ ও যৌনইচ্ছা কমে যায়। ডোপামিন বিরোধী ওষুধ দিয়ে প্রোল্যাকটিন বৃদ্ধির চিকিৎসা করলে যৌনইচ্ছা ও টেস্টোস্টেরনের মাত্রা বৃদ্ধি পায়।

(ঘ) ডায়াবিটিস মেলাইটাস— ডায়াবিটিস থাকলে লিঙ্গকোষে নাইট্রিক অক্সাইড তৈরি কম হয়। এছাড়া বয়স্কদের ক্ষেত্রে ডায়াবিটিসের কারণে তুলনামূলক ভাবে বড়

রক্তবহানালিকার পরিবর্তন ঘটে; কম বয়সীদের মধ্যে তুলনামূলকভাবে ছোট ছোট রক্তবহানালিকার স্বাভাবিকত্ব নষ্ট হয় এবং তা নির্ভর করে কতদিন ধরে ডায়াবিটিস আছে এবং রক্তের শর্করা কতটা নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে—এসবের উপর। এছাড়া ডায়াবিটিসে নার্ভের বৈকল্যও ঘটে। আর এইসব মিলিয়েই ডায়াবিটিসে আক্রান্ত পুরুষের লিঙ্গোত্থানের অস্বাভাবিকত্ব আসে। দেখা গেছে শতকরা ৩৫ থেকে ৭৫ ভাগ ডায়াবিটিসের রোগীই লিঙ্গ দৌর্বল্যে ভোগেন।

(ঙ) মানসিক— মানসিক কারণে লিঙ্গ দৌর্বল্যের পেছনে সফলভাবে যৌনমিলন করতে পারা বা না পারা সম্পর্কিত উদ্বেগ, হতাশা, সঙ্গিনীর সঙ্গে সম্পর্কগত বিরোধ, তার প্রতি আগ্রহের অভাব, যৌনতা সম্পর্কিত কিছু নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী ও মানসিকতা, কম বয়সে যৌননিগ্রহের অভিজ্ঞতা, কিভাবে যৌনক্রিয়া করা হবে সে সম্পর্কিত মতবিরোধ, সঙ্গিনী গর্ভবতী হয়ে পড়বে এই ধরনের ভয়, যৌনরোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা সংক্রান্ত ভীতি ইত্যাদি নানা কিছুই ভূমিকা পালন করে। যৌন দৌর্বল্যের প্রায় সব রোগীই এবং এমনকি যে সমস্ত পুরুষের যৌনদৌর্বল্যের পেছনে স্পষ্টভাবে কোন শারীরগত কারণ রয়েছে, তাদেরও প্রায় সবাইই একসময় কম বেশি মানসিক এই ধরনের কারণগুলির শিকার হন। মানসিক কারণে যৌনদৌর্বল্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে প্রথমত সুষুম্না কান্ডের স্যাক্রাল অংশের সংশ্লিষ্ট নার্ভের যথেষ্ট উত্তেজনা ঘটে না, ফলে লিঙ্গে রক্ত সঞ্চালন যথেষ্ট হয় না;দ্বিতীয়ত উদ্বেগ ইত্যাদির কারণে সিমপ্যাথেটিক নার্ভের অতিসক্রিয়তা লিঙ্গের অনৈচ্ছিক মাংসপেশীকে সঙ্কুচিত করে রাখে, ফলে লিঙ্গে উপযুক্ত পরিমাণ রক্ত জমতে পারে না তথা স্বাভাবিক লিঙ্গোত্থান ঘটে না।

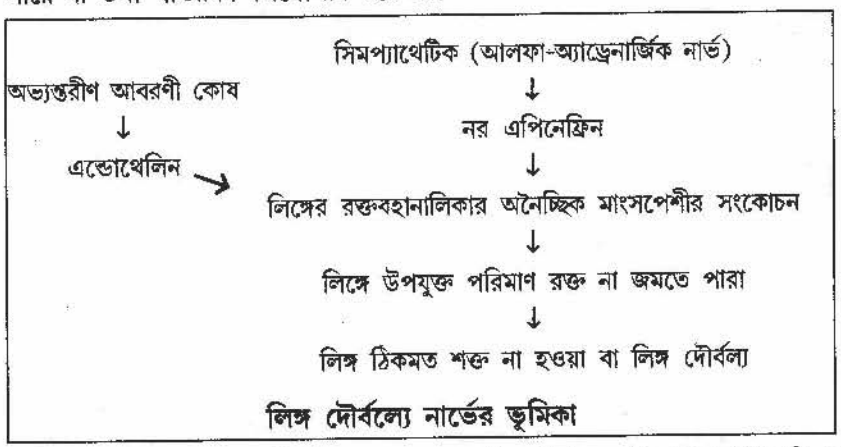

লিঙ্গ দৌর্বল্যে নার্ভের ভূমিকা

(চ) ওষুধের কারণে— কি কি ওষুধের কারণে লিঙ্গদৌর্বল্য ঘটে তার একটি তালিকা আগেই দেওয়া হয়েছে। নিয়মিত নানা ওষুধপত্র খেয়ে থাকেন, এমন পুরুষদের মধ্যকার একটি প্রাথমিক সমীক্ষায় দেখা গেছে তাঁদের চারজনের মধ্যে একজনই (শতকরা প্রায়

২৫ ভাগ) আংশিক বা সম্পূর্ণ লিঙ্গ দৌর্বল্যের শিকার হয়ে থাকেন। অম্বলের কিছু ওষুধ (এইচ-২ অ্যান্টাগনিস্ট), স্পাইরানোল্যাকটোন, ইস্ট্রোজেন ইত্যাদি গোনাডোট্রাফিনের কাজকে বাধা দিয়ে বা অ্যান্ড্রোজেনের কাজ কমিয়ে দিয়ে যৌন দৌর্বল্যের সৃষ্টি করে। অন্যদিকে হতাশা বিরোধী ও মনোরোগে ব্যবহৃত নানা ওষুধপত্র যৌনক্রিয়ার প্রায় সমস্ত অংশকেই বিপর্যস্ত করে, লিঙ্গোত্থান ঠিকমত হয় না, বীর্যপাত বিপর্যস্ত হয়, চরম আনন্দ ও যৌন আগ্রহ উভয়ই কমে যায়। ডিগক্সিনের মত ওষুধ আবার ' সোডিয়াম আয়ন, পটাসিয়াম আয়ন—এডেনোসিন ট্রাইফসফাটেজ পাম্প' নামক কোষাবরণীর তড়িৎ রাসায়নিক প্রক্রিয়াকে বন্ধ করে দেয়;এর ফলে কোষের মধ্যে ক্যালসিয়াম আয়নের পরিমাণ বেড়ে যায় যা আবার লিঙ্গমধ্যস্থ অনৈচ্ছিক মাংসপেশীর সংকোচন ঘটায় এবং এর ফলে লিঙ্গের মধ্যে উপযুক্ত পরিমাণ রক্ত জমতে পারে না তথা যৌনদৌর্বল্য ঘটে।

লিঙ্গ দৌর্বল্য নিছক মানসিক কারণে হয়েছে নাকি তার পেছনে শারীরিক কোন ত্রুটি আছে তা নির্ধারণ করার সহজ উপায় হচ্ছে রাত্রে ঘুমের মধ্যে বা ভোরের দিকে আপনাআপনি লিঙ্গোত্থান ঘটে কিনা তার ইতিহাস নেওয়া। এমনিতেই ঘুমের হাল্কা পর্যায়ে (অর্থাৎ যখন চোখের মণি দ্রুত নড়াচড়া করে—Rapid Eye Movement sleep বা REM sleep) ও ভোরের দিকে, যৌনক্রিয়া বা যৌনচিন্তা করা না হলেও স্বাভাবিক ভাবেই লিঙ্গ শক্ত হয়। তা যদি হয় অথচ সঙ্গিনীর সঙ্গে যৌনমিলন করতে গিয়ে যদি দেখা যায় লিঙ্গ ঠিক মত শক্ত হচ্ছে না, তবে বুঝতে হবে এই ধরনের যৌন দৌর্বল্যের পেছনে শারীরিক কোন ত্রুটি নয়, নিছক মানসিক কিছু দিক ভূমিকা পালন করছে। এর সহজবোধ্য কারণ হচ্ছে ঘুমের মধ্যে বা ভোরের দিকে (এবং হস্তমৈথুনের সময়ও) লিঙ্গ ঠিকমত শক্ত হওয়ার অর্থ সংশ্লিষ্ট নার্ভ, রক্তবহানালিকা ও লিঙ্গের মধ্যে রক্ত জমা থাকার অংশগুলি স্বাভাবিকভাবেই কাজ করছে। অন্যদিকে শারীরিক ত্রুটির জন্য লিঙ্গদৌর্বল্য ঘটলে তা ধীরে ধীরে ও অপরিবর্তনীয়ভাবে ঘটবে। তখন ঘুমের মধ্যে, ভোরে বা হস্তমৈথুন ইত্যাদির সময়ও লিঙ্গোত্থান দুর্বল হবে বা বেশিক্ষণ থাকবে না। একই ব্যাপার ঘটবে যৌনমিলনের সময়ও। অন্যদিকে যৌনতার প্রতি আগ্রহ ও যৌনক্রিয়ার ইচ্ছা কমে যাওয়ার সঙ্গে লিঙ্গ দৌর্বল্য থাকলে তা হরমোনগত বৈকল্যের ইঙ্গিত দেয় (প্রোল্যাকটিন বেড়ে যাওয়া বা টেস্টোস্টেরন কমে যাওয়া)। আবার বিশেষ একজনের সঙ্গে যৌনমিলনের সময় উপযুক্ত লিঙ্গোত্থান ঘটছে অথচ অন্য আরেকজনের সঙ্গে তা ঘটছে না এটি পুরোপুরিই মানসিক। নতুন সঙ্গিনীর সঙ্গে বা বিবাহবহির্ভূত সম্পর্ক স্থাপনের সময়ও অনেক সময় প্রকৃত আগ্রহ (প্রেম!) না থাকা, অপরাধবোধ, সামাজিক ও অন্যান্য ভীতি ইত্যাদি নানা কারণে মানসিক যৌনদৌর্বল্য ঘটতে পারে। অর্থাৎ বিশেষ পরিস্থিতিগত যৌনদৌর্বল্য শারীরিক ত্রুটির জন্য নয়, —মানসিক কারণেই ঘটে। এবং এক্ষেত্রে বীর্যপাতের পরিমাণে কোন অস্বাভাবিকত্ব থাকে না, তবে তা দ্রুত বা দেরিতে হতে পারে।

পুরুষের লিঙ্গ-দৌর্বল্য যদি নিছক মানসিক কারণে নয় বলে বোঝা যায় তবে কিছু

কিছু পরীক্ষার ব্যবস্থা করা যেতে পারে, যাতে বোঝা যায় ঠিক কি কারণে এই অস্বাভাবিকত্ব। ডায়াবিটিস মেলাইটাস, উচ্চরক্ত চাপ, হৃদরোগ, ধূমপান, মদ্যপান, রক্তে লিপিডের পরিমাণ, রক্ত বহা নালিকার রোগ, অন্তঃক্ষরা গ্রন্থির বা নার্ভের কোন রোগ ইত্যাদির জন্য ইতিহাস নেওয়া ও আনুষঙ্গিক পরীক্ষাদি করার প্রয়োজন হয়। রক্তে প্রল্যাকটিন ও গোনাডোট্রাফিনের পরিমাণও নির্ধারণ করা দরকার। মনে রাখা দরকার রক্তে প্রল্যাকটিনের অতিরিক্ত পরিমাণের কারণে যৌন ইচ্ছা কমে যাওয়া বা লিঙ্গোত্থানের অস্বাভাবিকত্ব দেখা দিতে পারে। এছাড়াও লিঙ্গের ডপ্‌লার আলট্রাসাউণ্ড পরীক্ষা, লিঙ্গের রক্ত বহা নালিকার চিত্রগ্রহণ (পেনাইল অ্যাঞ্জিওগ্রাফি), ডাইনামিক ইনফিউশান ক্যাভার্নোসোগ্রাফি বা ক্যাভার্নোসোমেট্রি, লিঙ্গের নার্ভের পরীক্ষা (যেমন বায়োথেসিওমেট্রিগ্রেডেড ভাইব্রেটরি পারসেপশান, সোমাটোসেনসরি ইভোক্‌ড পোটেনশিয়েল ইত্যাদি), লিঙ্গের রাত্রিকালীন উত্থান ও শৈথিল্যের পরীক্ষা ইত্যাদি বিশেষ ধরনের কিছু কিছু পরীক্ষাও করা হয়। অবশ্য সাধারণভাবে এসব পরীক্ষা ব্যয় সাধ্য এবং সর্বত্র তার সহজ সুযোগও থাকে না।

লিঙ্গ দৌর্বল্যের চিকিৎসা— প্রাথমিকভাবে এই চিকিৎসার প্রধান দিক হচ্ছে লিঙ্গ দৌর্বল্যের পেছনে কোন মানসিক কারণ আছে কিনা বা কতটা আছে তা খুঁজে বের করে আলাপ-আলোচনা ও মনোচিকিৎসার মধ্য দিয়ে তা যতটা সম্ভব দূর করার চেষ্টা করা। প্রয়োজনে সঙ্গিনীর সঙ্গে কথাবার্তা বলে তাঁর সহযোগিতার ব্যবস্থাও করা দরকার। সংশ্লিষ্ট পুরুষের মধ্যে যৌনমিলনের প্রতি ভীতি বা উদ্বেগ দূর করা, কোন অপরাধবোধ থাকলে তার মোকাবিলা করা, ধূমপান-মদ্যপান বন্ধ করা বা নুন্যতম করা, অতি ব্যস্ত জীবন যাপন পদ্ধতির পরিবর্তন, কোকেন-হেরোইনের মত ড্রাগে আসক্তি থাকলে তার চিকিৎসা করা— এসবও গুরুত্বপূর্ণ।

ওষুধের মধ্যে সিলডেনাফিল (sildenafil) হচ্ছে একমাত্র পদার্থ যা মুখে খাইয়ে লিঙ্গোত্থানের চিকিৎসা করা যায়। এটি খাওয়ার এক-দেড়ঘন্টা পরে লিঙ্গোত্থানের উন্নতি বোঝা যায়। তবে বয়স্কদের মধ্যে বা যাদের কিডনির রোগ আছে আর যাঁরা ইরিথ্রোমাইসিন, সাইমেটিডিন, কিটোকোনাজোল, ইত্যাদি ওষুধ খাচ্ছেন তাঁদের জন্য এর ব্যবহার সাবধানে করা উচিত এবং কম পরিমাণে প্রয়োগ করা উচিত। সিলডেনাফিল শুধু লিঙ্গোত্থানেই সাহায্য করে। কিন্তু এর দ্বারা যৌন ইচ্ছা, চরম আনন্দলাভ বা বীর্যপাত ইত্যাদি প্রভাবিত হয় না। এর ব্যবহারে কিছু অবাঞ্ছিত প্রতিক্রিয়াও হয়, যেমন মাথার যন্ত্রনা, মুখ লাল হয়ে যাওয়া, বদহজম, নাক বন্ধ হওয়া, চোখে নীল রঙ দেখা বা রঙ চেনার গন্ডগোল ইত্যাদি। যে সব হৃদরোগী নাইট্রেট ওষুধ কোন না কোনভাবে গ্রহণ করেন তাঁদের ক্ষেত্রে এর ব্যবহার নিষিদ্ধ। যাঁরা হার্ট ফেল-এর রোগ, হৃদপিন্ডের মাংসপেশীর রোগ (cardiomyopathy), উচ্চরক্তচাপ ইত্যাদিতে ভোগেন তাঁদের মধ্যেও এটি নিষিদ্ধ বা অতি সতর্কভাবে ব্যবহার করা উচিত।

যদি শরীরে টেস্টোস্টেরনের অভাবের কারণে লিঙ্গোত্থানের অসুবিধে ঘটে তবে টেস্টোস্টেরনও দেওয়া যায়। কিন্তু রক্তে টেস্টোস্টেরনের পরিমাণ স্বাভাবিক থাকা সত্ত্বেও যদি লিঙ্গ দৌর্বল্য থাকে, তবে ঐ ক্ষেত্রে টেস্টোস্টেরন দিয়ে কোন লাভ হয় না। ইনজেকশান করে, মুখে খাইয়ে বা চামড়ার প্যাচ (patch)-এর মাধ্যমে এর প্রয়োগ করা যায়। তবে সবচেয়ে ভাল হয় ২-৩ সপ্তাহ অন্তর ২০০-৩০০ মিলিগ্রাম পরিমাণ মাংসপেশীতে ইনজেকশান করে দিলে। মুখে খেলে অনেক সময় যকৃতের গন্ডগোল দেখা যায়; তাই না দেওয়াই ভাল। চামড়ায় প্যাচ-এর মাধ্যমে দিলে প্রতিদিনই এই প্যাচপাল্টানোর প্রয়োজন হয়। যাঁদের বিশেষ ধরনের ক্যান্সার আছে (androgen-sensitive cancer), প্রস্রাবের অসুবিধে আছে (bladder neck obstruction) তাঁদের ক্ষেত্রে টেস্টোস্টেরন প্রয়োগ করা উচিত নয়।

এছাড়া ওষুধের মধ্যে প্রটাগ্ল্যান্ডিন ই-১ (Prostaglandin E_1)-ও দেওয়া যায়। এটির প্রচলিত নাম অ্যালপ্রোস্টাডিল। কিন্তু এটিকে প্রস্রাব নালীর মধ্যে ঢোকাতে হয়। ১২৫-১০০০ মাইক্রোগ্রাম অ্যালপ্রোস্টাডিল-এর নরম গুলি (pellet) বিশেষ প্রক্রিয়ায় (applicator -এর সাহায্যে) প্রস্রাব নালীর মধ্যে ঢোকানো হয়। দেখা গেছে পরীক্ষাগারের মধ্যে ৬৫ ভাগ পুরুষের লিঙ্গই এর ফলে বেশ ভালই শক্ত হয়। কিন্তু বাড়ি ফিরে স্ত্রী বা সঙ্গিনীর কাছে গিয়ে বাস্তবে বড় জোর এদের মধ্যে শতকরা ৫০ জন সফলভাবে যৌনমিলন করতে পারেন। কৃত্রিমভাবে তৈরি অ্যালপ্রোস্টাডিল (১-৪০ মাইক্রো গ্রাম) লিঙ্গের মধ্যে ইনজেকশান করলে শতকরা ৭০-৮০ ভাগ ক্ষেত্রেই সাফল্য আসে। কিন্তু ইনজেকশান দেওয়া, ব্যথা লাগা ইত্যাদি ঝামেলায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই পদ্ধতি গ্রহণযোগ্য হয় না। ব্যথা ছাড়া লিঙ্গের যন্ত্রণাদায়ক দীর্ঘকালীন উত্থান (priapism) এবং বারবার ব্যবহারের ফলে লিঙ্গের কলা (tissue)-র স্থায়ি পরিবর্তনও ঘটতে পারে।

ওষুধ ছাড়া বিশেষ প্রক্রিয়ায় লিঙ্গের মধ্যে শিরার রক্ত টেনে এনে, লিঙ্গের উত্থান ঘটিয়ে এবং তারপর আংটির মত জিনিস (constrictionsring) লিঙ্গে পরিয়ে দেওয়া হয় (Vacuum Constriction Devices;VCD)। তবে এই পদ্ধতিও তার পদ্ধতিগত জটিলতার জন্য সবার কাছে গ্রহণীয় হয় না। তাছাড়া এর জন্য লিঙ্গে ব্যথা, অবশভাব, কালশিটে পড়া এবং বীর্যপাতের গন্ডগোল হতে পারে।

অস্ত্রোপচারের সাহায্যেও কৃত্রিমভাবে লিঙ্গের শক্তভাব আনানো যায়। অস্ত্রোপচার করে লিঙ্গের মধ্যে, বেলুনের মত ফোলানো যায় এমন একটি জিনিষ বা শক্ত অথচ নমনীয় দন্ড প্রবেশ করিয়ে দেওয়া হয়। অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য ও কাটাকুটি করার ব্যাপার থাকলেও অনেকেই এটি পছন্দ করেন। বিশেষত যাঁদের অন্য কোনভাবে লিঙ্গের শিথিলভাব দূর করা সম্ভব হয়নি, তাঁদের ক্ষেত্রে এটিই সর্বশেষ উপায় হিসেবে গ্রহণ করা হয়।

আকুপাংচার চিকিৎসার সাহায্যেও লিঙ্গ দৌর্বল্য অনেক ক্ষেত্রে দূর করা যায় বলে দেখা গেছে। এই পদ্ধতিতে ওষুধ বা বা অস্ত্রোপচার ছাড়াই, শরীরের বিশেষ কিছু বিন্দুতে

সূক্ষ্ম সূচ ফুটিয়ে এবং সঙ্গে বৈদ্যুতিক উত্তেজনা দিয়ে, স্নায়বিক সক্রিয়তা তথা সংশ্লিষ্ট জৈব রাসায়নিক পদার্থের ভারসাম্য ঠিক করা যায়। কোমরে, তলপেটে, পায়ে ও কানে আকুপাংচারের বিশেষ কিছু বিন্দু আছে যা লিঙ্গ দৌর্বল্য ও বীর্যপাতের অস্বাভাবিকত্বের জন্য প্রয়োগ করা হয়। দেখা গেছে মোটামুটি ২-৩ মাসের চিকিৎসায় শতকরা প্রায় ৫০ ভাগ রোগীই সন্তোষজনকভাবে লিঙ্গ দৌর্বল্য কাটিয়ে সফল যৌনমিলন (তথা সন্তান লাভ) করতে সমর্থ হতে পারেন।

আর যে চিকিৎসাই করা হোক না কেন, সঙ্গে মানসিক চিকিৎসা এবং যৌনতাসম্পর্কিত চিকিৎসা (sex therapy) করারও প্রয়োজন হতে পারে। এর জন্য স্বামী-স্ত্রী তথা যৌন সঙ্গী ও সঙ্গিনী উভয়কে এক সঙ্গে নিয়ে আলোচনা করা যায়। যৌনমিলনের আগে কি কি করা দরকার হতে পারে (foreplay) , যৌনমিলনের বিশেষ ভঙ্গী ও উভয়ের পক্ষে স্বস্তিকর গ্রহণীয় পরিবেশ কি ইত্যাদি বিষয়ে কথাবার্তা বলে উপযুক্ত পদ্ধতি গ্রহণ করলে অনেক ক্ষেত্রে সুফল পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে লজ্জা বা সঙ্কোচ কাঠিয়ে উঠে সুস্থ পদক্ষেপ নেওয়ার মানসিকতা অর্জন করা দরকার। মনে রাখা দরকার যৌনতা কোন অপরাধ বা অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়। উভয়ের সম্মতি সাপেক্ষে পূর্ণবয়স্ক নারী-পুরুষের যৌনমিলনও কোন অপরাধমূলক কাজ নয়। উপযুক্ত বয়সে সুশৃঙ্খল সুস্থ যৌনতা ব্যক্তি ও সমাজ উভয়ের সুস্বাস্থ্যের জন্যই প্রয়োজন। এবং সেটি নারী ও পুরুষ তথা স্বামী ও স্ত্রী দু'জনের পক্ষেই প্রযোজ্য।

[গণ্ডারের শিং-এর গুঁড়ো বা বাঘের মাংস থেকে শুরু করে, পেঁয়াজ, রসুন, মাছ-মাংস ইত্যাদি সম্পর্কে ধারণা আছে যে, এগুলি নাকি যৌন ইচ্ছা ও যৌন ক্ষমতা বাড়ায়। যৌন ইচ্ছা বর্ধণকারী পদার্থকে বলা হয় aphrodisiac -গ্রীক প্রেমের বা যৌনতার দেবী Aphrodite (আফ্রোদিতি)-র নাম অনুসারে। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি এদের কোনটিই যৌনইচ্ছা বাড়াতে পারে না। Aphrodisiac সম্পর্কিত ধারণা এক ধরনের সংস্কার বা গল্প কথা (myth) মাত্র।]

(৬)

প্রাকবিবাহ যৌনতা ও বয়ঃসন্ধিতে যৌন মিলন

একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে বর্তমানে এদেশে তরুণ জনসংখ্যার শতকরা ৩০ ভাগেরই প্রাক বিবাহ তথা কম বয়সেই, যৌন অভিজ্ঞতা হয়। তবে তা সমাজ অনুমোদিত নয়। কিন্তু এক সময় আমাদের দেশে অতি অল্প বয়স থেকে, বয়ঃসন্ধি হতে না হতেই, ছেলে-মেয়েদের যৌন ক্রিয়াকলাপে লিপ্ত হওয়ার ব্যাপারটা সমাজ অনুমোদিত ও আইনসম্মত ছিল, এবং তাকে প্রবলভাবে উৎসাহিত করাও হত। বর্তমানে পাশ্চাত্যের বহু দেশে এই ব্যাপারটি চলছে, যদিও তা সর্বজনগ্রাহ্য নয় বা সরাসরি উৎসাহিত করা হয় না।

গৌরীদান একসময় 'হিন্দুধর্মের' একটি অংশ ছিল। বর্তমানে ১৮ বছরের নীচে মেয়েদের ও ২১ বছরের নীচে ছেলেদের বিয়ে করা বেআইনি হলেও, আগে প্রথম রজোদর্শন অর্থাৎ মাসিক ঋতুস্রাব শুরু হওয়ার আগে মেয়েদের বিয়ে না দেওয়াটা সামাজিক অন্যায় বলেই গণ্য করা হত। আর তারপর দু'চারবছর কেটে গেলে তো মেয়ে হয়ে যেত 'অরক্ষণীয়া'। ফলস্বরুপ ১২-১৪ বছর বয়স হয়ে যেতেই একটি মেয়ে গর্ভবতী হত, বছরের পর বছর সন্তানের জন্ম দেওয়া, তাকে স্তন্যদান করা, আবার গর্ভবতী হওয়া—এই চক্রে বাঁধা পড়ত এদেশের নারীদের স্বল্পায়ু জীবন। সঙ্গে ছিল অপুষ্টি, সংসারের অমানুষিক পরিশ্রম, গৃহে আবদ্ধ সংকীর্ণ জীবন। সব মিলিয়ে অল্প বয়সেই শেষ হয়ে যেত মেয়েরা। 'কুড়িতেই বুড়ি'। বর্তমানে এ অবস্থা কিছুটা পাল্টেছে, বিশেষত শিক্ষিত স্বচ্ছল পরিবারে। আগে ছিল উল্টোটা। সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ বা হিন্দু পরিবারে মেয়েদের গৌরীদান ছিল পারিবারিক মর্যাদার সঙ্গে জড়িত। তবে এখনো এদেশের গ্রামে গঞ্জে বস্তিতে, দরিদ্র অশিক্ষিত পরিবারে ১৮ বছরের কম বয়সী মেয়েদের বিয়ে দিয়ে দেওয়ার প্রবণতা আছে, বেআইনি হলেও। এদের মধ্যে কেউ কেউ পুলিশের হাতে আর আইনী বেড়াজালে ধরাও পড়ে। তবু এ দেশে প্রতি চারজনের মধ্যে একটি মেয়েই কিশোরী অবস্থায় বিয়ের পিঁড়িতে বসে।

অন্যদিকে পাশ্চাত্যের বহু দেশেই বয়ঃসন্ধি হতে না হতেই অনেক ছেলে-মেয়ে বান্ধবী বা বন্ধু জুটিয়ে বাইরে রাত কাটাতে থাকে (dating) এবং যৌনমিলনের অভিজ্ঞতা লাভ করে। অবাঞ্ছিত গর্ভ এড়াতে গর্ভনিরোধকের ব্যবহারও চলে এবং কখনো কখনো মায়েরা লুকিয়ে মেয়ের খাবারের সঙ্গে গর্ভনিরোধক বড়ি খাওয়ান। আর যদি মেয়েটি ঘটনাচক্রে গর্ভবতী হয়ে পড়ে, তবে গর্ভপাত করানোর আয়োজনও রয়েছে। কিন্তু বিশেষ করে মানসিক আঘাত পায় মেয়েটিই এবং সারাজীবন ঐ স্মৃতি তাকে তাড়না করে বেড়ায়। তুলনামূলকভাবে ছেলেরা এই ধরনের স্মৃতির যন্ত্রণায় ভোগে অনেক কম। এবং ঐ সব

দেশের উন্নত চিকিৎসা পরিষেবা, পুষ্টি ও স্বাস্থ্যবিধির কারণে মেয়েদের গর্ভপাতজনিত শারীরিক জটিলতাও তেমন হয় না। পাশাপাশি যৌনতা সম্পর্কিত ভারতীয় মধ্যবিত্তমূলক মূল্যবোধ ও সংস্কার বা সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গীও অনেক কম। সব মিলিয়ে ঐসব দেশে বয়ঃসন্ধির পর থেকে, বৈবাহিক সম্পর্ক ব্যতিরেকে যৌন সম্পর্ক স্থাপন নিয়ে ব্যক্তিগত বা সামাজিক আলোড়নও তুলনামূলকভাবে অনেক কম।

কিন্তু বিপদ ঘটেছে অন্য জায়গায়। তার একটি হল শারীরিক, অন্যটি মানসিক। শারীরিক বিপদের অন্যতম হচ্ছে এইডস-এর মত মারণরোগের প্রসার। উপযুক্ত সুরক্ষা ব্যবস্থা (যেমন কন্ডোম) না নিয়ে কম বয়সে একাধিকজনের সঙ্গে যৌনমিলনের ফলে কমবয়সী ছেলেমেয়েদের মধ্যে এইডস-এর প্রকোপ এখন ভয়াবহভাবে বেড়ে চলেছে। ব্যাপারটি শুধু আমেরিকার মত উন্নত দেশে নয়, আফ্রিকার মত পিছিয়ে থাকা মহাদেশেও ঘটছে। পাশ্চাত্যের নানা দেশে যেমন বহু কমবয়সী ছেলেমেয়ে তথাকথিত বৈবাহিক সম্পর্ক হওয়ার আগে যৌন অভিজ্ঞতা লাভ করে, ল্যাটিন আমেরিকা ও আফ্রিকার নানা দেশেও একই ছবি।

১৯৯৫-৯৬ সালের বিভিন্ন সমীক্ষায় অবিবাহিত অবস্থায় যৌনমিলনের অভিজ্ঞতা লাভের পরিসংখ্যান কয়েকটি দেশে এইরকম বলে দেখা গিয়েছিল—

	ছেলেদের মধ্যে (শতকরা)	মেয়েদের মধ্যে (শতকরা)
আমেরিকা	৫৬	৫১
কানাডা	৪২	৫১
ক্যামেরুন	৪৬	৪২
মোজাম্বিক	৬৪	৪২
টোগো	৯৮	৫১
হণ্ডুরাস	৫৮	১৫
জাম্বিয়া	৬৬	৪৪
কেনিয়া	৫৪	৩৭
বলিভিয়া	৩৮	১৩
ব্রাজিল	৬৩	২৪
নিকারাগুয়া	৫৫	৬
নেপাল	তথ্যপাওয়া যায়নি	১
ভারত	ছেলেমেয়ে মিলিয়ে প্রায় ৩০	

এবং এই সব ছেলেমেয়েদের অধিকাংশই ১৮-২০ বছর বয়সের আগেই এই অভিজ্ঞতা লাভ করেছে। আর এর প্রতিফলন ঘটেছে যে সব দেশে এমন অপ্রাপ্তবয়স্ক যৌনতা বেশি ঐ সব দেশে এইডস-এর অত্যধিক প্রসারের মধ্যে। বর্তমানে প্রতি ১২ সেকেন্ডে

এই পৃথিবীর কোথাও না কোথাও ১৫-২৪ বছর বয়সী কিশোর-কিশোরী বা যুবক-যুবতী এইডস-এ আক্রান্ত হচ্ছে। এই হার আফ্রিকা-আমেরিকার বিভিন্ন দেশেই সবচেয়ে বেশি।

প্রসঙ্গত এটিও উল্লেখ্য যে এইডস-এর ভাইরাসদ্বারা সংক্রমিত হওয়ার ব্যাপারে মেয়েরা ছেলেদের তুলনায় অনেক বেশি বিপদের মধ্যে থাকে, বিশেষ করে কমবয়সী মেয়েরা। তাদের মধ্যে এইডস-এর ভাইরাস (এইচ আই ভি) খুব সহজে যেমন ছড়ায়, তেমনি শারীরিকভাবে তারা তুলনামূলকভাবে বেশি বিপর্যস্ত হয়। যৌনমিলনের সময় মেয়েদের যোনি অনেক বেশি এলাকা পুরুষের বীর্যের সংস্পর্শে আসে। এছাড়া মাসিক ঋতুচক্রের মাঝামাঝি কয়েকদিন (যে সময় ডিম্বকোষ নির্গত হয় অর্থাৎ ovulation-এর সময়) জরায়ু মুখের (cervirx-এর) মিউকাস আবরণী (mucus plug) পাৎলা হয়ে যায়। এই মিউকাস বহিরাগত জীবাণু বা ভাইরাসের বিরুদ্ধে বর্মের মত কাজ করে। ঋতুচক্রের বিশেষ ঐ সময়ে এইডস-ভাইরাসের বাহক পুরুষের সঙ্গে যৌনমিলন ঘটলে স্বাভাবিকভাবেই এই ভাইরাস সহজে নারীর শরীরে প্রবেশ করে। কমবয়সী মেয়েদের যোনি পথে যৌনমিলনের সময় জলীয় পদার্থের নিঃসরণ বয়স্কাদের তুলনায় কম ঘটে। এর ফলেও এইচ আই ভি ভাইরাস শরীরে প্রবেশ করার ক্ষেত্রে কম বাধা পায়। সব মিলিয়ে কমবয়সে, বিশেষত একাধিক সঙ্গী-সঙ্গিনীর সঙ্গে যৌনমিলন এইডস-এর মত মারণরোগটি প্রসারের ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

তবু যদি সত্যিকারের ভালোবাসা ও পারস্পরিক বিশ্বাস থেকে কোন একটি ছেলে-মেয়ে মিলিত হয় এবং পরবর্তী জীবনে বিয়ে বা একত্রে থাকা (live together) যেভাবেই হোক না কেন দু'জনে একসাথে থাকে এবং অন্য যৌনসঙ্গী বা সঙ্গিনী না নেয় তাহলে এইডস-এর প্রসার ঘটার সম্ভাবনা প্রায় শূন্যে নেমে আসে। কিন্তু সাধারণত যা হয়, বয়ঃসন্ধির তাৎক্ষণিক আবেগ ও যৌন-আগ্রহ এই ধরনের কিশোর কিশোরীদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে এবং বিপদ সম্পর্কে চিন্তা করার অবকাশ দেয় না। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই বয়সের যৌনসঙ্গী বা সঙ্গিনী সারাজীবনের সঙ্গী বা সঙ্গিনী হয় না। এর ফলে বিপদ বাড়ে। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও উন্নত জীবনযাপন প্রণালীর ফলে সিফিলিস বা গনোরিয়ার মত যৌনরোগের প্রসার বহুজনের সঙ্গে শৃঙ্খলাহীন যৌনমিলনের ফলে এখন আর ততটা ঘটে না, —বিশেষত উন্নত দেশগুলিতে। কিন্তু ঘটছে এইডস-এর প্রসার। আর সিফিলিস বা গনোরিয়ার তবু উপযুক্ত চিকিৎসা আছে, যার সাহায্যে এদের সম্পূর্ণ নিরাময় করা যায়। এইডস-এর ক্ষেত্রে তা নয়। সম্প্রতি কিছু ওষুধপত্র আবিষ্কৃত হলেও চূড়ান্ত অর্থে এইডস সারিয়ে দেওয়ার মত কোন চিকিৎসাপদ্ধতি এখনো অজানা। সাম্প্রতিক পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, এইচ আই ভি-তে আক্রান্ত প্রতি পাঁচজনের মধ্যে বড়জোর একজন (তাও উন্নত জীবনযাপন প্রণালীর ফলে) আজীবন মোটামুটি সুস্থ থাকতে পারে। কিন্তু তিনজনই কয়েক বছরের মধ্যে মারা যায় এবং বাকি একজন সুস্পষ্টভাবে নানা কষ্টে ভুগতে থাকে। আমেরিকায় ২৫-৪৪ বছর বয়সী পুরুষদের মধ্যে মৃত্যুর কারণগুলির মধ্যে এইডস এখন প্রথম স্থানে,

মহিলাদের মধ্যে চতুর্থ স্থানে।

এই অবস্থায় বয়ঃসন্ধির মানসিক আবেগ ও শারীরিক যৌনচাহিদা নিয়ন্ত্রণ করাটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যদি মনে হয় সত্যিকারের ভালোলাগা ও ভালোবাসার একজনকে পাওয়া গেছে, তবে তার সঙ্গে মানসিক সম্পর্ক অবশ্যই রাখা যায় এবং তা উচিতও। কিন্তু শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন করার আগে ভাবা দরকার। মুস্কিল হয় এই বয়সের ছেলেমেয়েরা এই ভাবার মত অবস্থায় প্রায়শই থাকেনা। এ ক্ষেত্রে অভিভাবকদের দায়িত্ব রয়েছে অনেকটাই। এই বয়সে যৌনমিলনের বিপদ সম্পর্কে ছেলেমেয়েদের ওয়াকিবহাল করা, পাশাপাশি তাদের সঙ্গ দেওয়া, তাদের সুস্থ বিনোদনের ব্যবস্থা করা, স্নেহ ও মমতা দিয়ে তাদের মধ্যে বাবা-মায়ের উপর নির্ভরতা ও শ্রদ্ধা জাগানো, সমবয়সী ছেলেমেয়েদের সঙ্গে মেশামেশির ব্যাপারে অহেতুক খবরদারি না করা বা বিধিনিষেধ আরোপ না করার মত কাজগুলি অভিভাবকদেরই করা দরকার।

কম বয়সে যৌনমিলনের অভিজ্ঞতা লাভ করা এবং পরবর্তীকালে যৌন সঙ্গী বা সঙ্গিনী পাল্টানোর সঙ্গে এইডস-এর প্রসারের সম্পর্ক থাকলেও, এটিই একমাত্র কারণ নয়। এইডস-এর ব্যাপারে সতর্ক থাকলে (যেমন কণ্ডোম ব্যবহার করে) তবু তার প্রসার প্রতিহত করা যাবে। কিন্তু মানসিক ও ব্যক্তিগত বিপদগুলিও রয়েছে।

বয়ঃসন্ধির যে বয়স ভবিষ্যৎ জীবন গড়ে তোলার বয়স ঐ বয়সে যৌনক্রিয়াকলাপের মত কাজকর্মে লিপ্ত হয়ে পড়া প্রায়শই চাঞ্চল্য ও মানসিক বিক্ষিপ্ততার সৃষ্টি করে। ব্যাপারটি অনেক সময় নেশার মত দাঁড়িয়ে যায়, এর ফলে কারোকারোর সারাজীবনটাই বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। যে বয়সে যা শোভন ও করণীয় ঐ বয়সে তা না করলে কিছু বিশৃঙ্খলা ও বিপর্যয় দেখা দেবেই। বয়ঃসন্ধির বয়স কিন্তু যৌনতা শুরুরই বয়স। তবু স্থায়ি যৌনসম্পর্ক সৃষ্টি করার ও নিয়মিত যৌনমিলনের বয়স নয়,—অন্তত বর্তমানের সামাজিক পরিস্থিতিতে। আগে গৌরীদান বা বাল্যবিবাহের মত সামাজিক কুপ্রথার আমলে যা হওয়ার হয়েছে, এখন কিন্তু জানা আছে যে, পূর্ণ যৌবনের আগে যৌনমিলন নানাবিধ সমস্যার সৃষ্টি করে।

এর অন্যতম হল কমবয়সে গর্ভবতী হওয়ার জন্য মেয়েদের স্থায়ি স্বাস্থ্যহানি। বয়ঃসন্ধির বয়স শারীরিক-মানসিক বিকাশের বয়স। এই সময় গর্ভবতী হওয়ার অর্থ অপরিণত শরীরে একটি নতুন প্রাণের যাবতীয় চাহিদা মেটানো। গর্ভাবস্থায় শিশু মায়ের শরীর থেকেই যাবতীয় পুষ্টি গ্রহণ করে, প্রসবের পর স্তন্যদায়িনী অবস্থাতেও। তাই পরিপূর্ণভাবে যুবতী হওয়ার আগে অর্থাৎ মেয়েটির উপযুক্ত শারীরিক বিকাশ হওয়ার আগে একাধিকবার গর্ভবতী হওয়ার ফলে শরীর ভেঙ্গে যায়,—যে কারণে 'কুড়িতেই বুড়ি' জাতীয় কথাবার্তা আমাদের দেশে চালু হয়েছিল। তখনকার বিভিন্ন গল্প-উপন্যাসের কোন কোন নারী চরিত্র ২২ বছর বয়সেও যুবতী আছে বলে বর্ণনা করে তাকে ব্যতিক্রমী বলেই উল্লেখ করা হত। আর এ কারণে বর্তমানে কৈশোরে বিবাহ বেআইনী। কিন্তু দরিদ্র ও শিক্ষাহীন জনগোষ্ঠীর মধ্যে

এমন বিয়ে আমাদের মত দেশে যে এখনো ভালভাবে চালু আছে তা আগেই বলা হয়েছে।

অন্যদিকে কিছু আদিবাসী গোষ্ঠীর মধ্যে নিজস্ব ঐতিহ্য অনুযায়ী প্রাকবিবাহ যৌনতা ও অপ্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে যৌনতা এখনো টিকে আছে। বিশেষত 'ঘোটুল' প্রথার মধ্য দিয়ে এক ধরনের যৌনশিক্ষা তথা প্রজনন প্রশিক্ষণ ও প্রাসঙ্গিক অভিজ্ঞতা দেওয়ার চেষ্টা স্পষ্ট। দেখা গেছে এই ধরনের প্রাকবিবাহ যৌনতা সত্ত্বেও তাদের মধ্যে বহুগামিতা, বিবাহ বিচ্ছেদ, যৌনরোগ ইত্যাদির প্রকোপ নগণ্য। সেখানে মায়েরা মেয়েদের ঘোটুল-জীবনের যৌনতা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করে এবং সীমা লঙ্ঘন না করার বা গর্ভবতী না হওয়ার ব্যাপারে শিক্ষা দেয়।

আধুনিক সমাজে ঐ ধরনের ঘোটুল প্রথা আদিম ও স্থূল বলেই গণ্য হয়। কিন্তু অন্যভাবে তা চলছেই। বিয়ের বয়স নিয়ে যতই আইন করা হোক না কেন যৌনতার ব্যাপারটিকে যে এইভাবে রাষ্ট্রের দ্বারা আইনের ঘেরাটোপে আটকে রাখা যায় না তা স্পষ্ট। শুরুতেই যে পরিসংখ্যান দেওয়া হয়েছিল তার থেকেই এটি বোঝা যায়। ভারতের মত তথাকথিত রক্ষণশীল দেশেই যখন শতকরা ৩০ ভাগ তরুণ বিয়ের আগেই যৌন অভিজ্ঞতা লাভ করে, তখন তুলনামূলকভাবে কিছু খোলামেলা পরিবেশের দেশগুলির অবস্থা সহজেই অনুমেয়।

সত্যিকথা বলতে বিয়ের আগে যৌনমিলন বা যৌন অভিজ্ঞতা লাভ করার মধ্যে মূলগতঅর্থে কোন অন্যায় বা পাপবোধ থাকার কথা নয়। বিশেষত পরস্পরের সম্মতি সাপেক্ষে পূর্ণবয়স্ক নরনারীর যৌনমিলন কোন অপরাধ নয়,—তা সে মানুষের তৈরি করা 'বিবাহ' নামক সামাজিক প্রক্রিয়ার ছাড়পত্র পেয়েই হোক বা না পেয়েই হোক না কেন। প্রাপ্তবয়স্ক ছেলেই হোক, মেয়েই হোক—তার শরীরের উপর তার নিজেরই অধিকার। এই শরীর নিয়ে সে কি করবে, না করবে, তা সে-ই ঠিক করবে। এ ক্ষেত্রে কারোর অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপ কাম্য নয়। কাম্য নয় প্রাপ্তবয়স্কদের যৌনতা সম্পর্কে শুচিবাই বা সংস্কারাচ্ছন্ন চিন্তাও। শুধু তার শারীরিক বিপদ সম্পর্কে সতর্ক থাকাটাই জরুরী, সেগুলি হল,—

(১) অবাঞ্ছিত গর্ভ,
(২) এইডস-এর প্রসার,
(৩) কম বয়সে যৌনমিলনের ফলে বয়সোচিত অন্যান্য কাজের ব্যাঘাত,
(৪) কম বয়সে গর্ভবতী হয়ে পড়লে মেয়েদের শরীর ভেঙ্গে পড়া,
(৫) ভবিষ্যতের আবেগগত জটিলতা।

আর এটি তো বাস্তব সত্য যে, তথাকথিত ঐ বিয়ের উদ্দেশ্যই হল নারী ও পুরুষের স্বাভাবিক যৌন চাহিদা পূরণের সমাজ অনুমোদিত ও আইনী ছাড়পত্র দেওয়া। সঙ্গে সন্তানের জন্ম দেওয়া তথা প্রজাতির সংখ্যা বৃদ্ধি। এই সন্তানের জন্ম দেওয়ার ব্যাপারে আইনের খুব একটা কিছু করার নেই। অতি সম্প্রতি জনস্ফীতির বাস্তব ও প্রয়োজনীয়

কারণে অধিক সন্তানের জন্ম দেওয়াকে অনেক দেশে বেআইনী হয়তো করা হচ্ছে, তেমনি আবার হিন্দু মৌলবাদী বা মুসলিম মৌলবাদীদের পক্ষ থেকে বেশি সন্তানের জন্ম দিয়ে নিজ ধর্মের মানুষের সংখ্যা বাড়ানোর হাস্যকর ও বিপজ্জনক ফতোয়াও দেওয়া হচ্ছে। আর কোন দম্পতি যদি সন্তানের জন্ম নাও দেন তাহলেও কিছু করার নেই। যুদ্ধ বা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে জনসংখ্যা প্রচন্ড কমে গেলে কখনো কখনো অধিক সন্তানের জন্ম দেওয়াকে বাধ্যতামূলক করার আইনী নির্দেশ কোন কোন দেশে মাঝে মাঝে দেওয়া হয়। কিন্তু সাধারণভাবে যে কোন দম্পতি বিয়ে করেই হোক বা না করেই একত্রে (লিভ টুগেদার) থেকেই হোক, কোন সন্তানের জন্ম না দেওয়ার সিদ্ধান্তও নিতে পারেন। কেউ বা সক্ষম থাকলেও নিজেরা সন্তানের জন্ম না দিয়ে, কোন শিশুকে দত্তকও নিতে পারেন এবং অনেকে তা নেনও। তাই সন্তানের জন্য নর-নারীর স্বাভাবিক আগ্রহ থাকলেও, কেউ অন্যভাবেও ভাবতে পারেন এবং তা অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু সন্তান না নিলেও শারীরিক যৌন চাহিদা তথা যৌনতার ব্যাপারটি ব্যক্তিগতস্তরে থাকেই। এবং আইন, ধর্মীয় অনুশাসন বা সমাজের রক্ত চক্ষু কোনটির দ্বারাই এই যৌনতাকে সম্পূর্ণ অবরুদ্ধ করা সম্ভব নয়। যেমন কোন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান বা রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সঙ্ঘ (আর এস এস)-এর মত কোন সংগঠন, তাদের প্রাপ্তবয়স্ক নারী-পুরুষকে যৌনমিলন থেকে বিরত থাকার তথা ব্রহ্মচর্য পালন করার হাস্যকর ফতোয়া দেওয়া হয়। কিন্তু গোপনে বা আড়ালে আবডালে যৌনমিলন বা সমকামিতা চলেই। কখনো কখনো তা প্রকাশ হয়ে পড়লে তোলপাড় শুরু হয়ে যায়।

ইসলামের মত কোন কোন ধর্মে প্রাকবিবাহ যৌনতাকে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং এই নিষেধকে ধর্মীয় চরিত্র দেওয়া হয়েছে। আবার পাশাপাশি এক পুরুষের চারটি বিবাহকে ধর্মীয় অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। ব্যাপারটির মধ্যে পুরুষ তান্ত্রিকতার চরম বহিঃপ্রকাশ ঘটলেও, হযরত মহম্মদের সময় দেড় হাজার বছর আগেকার যে সামাজিক পরিবেশে, এই সব নিয়ম করা হয়েছিল তার মধ্যে নারীকে সামাজিক সুস্থিতি ও নিরাপত্তা দেওয়ার বিষয়টিই ছিল প্রধান। ঐ পরিবেশে নারীর ও তার সন্তানের কোন দায়িত্ব না নিয়েই তাদের ত্যাগ করার প্রবণতা ছিল অতি ব্যাপক। অধিকাংশ পুরুষই এইভাবে বহু নারীকে নিছক ভোগ্যবস্তুতে পরিণত করেছিল। ঐ পরিবেশে এই ধরনের নিয়ম ধর্মের নাম করে প্রতিষ্ঠা করার সামাজিক উপযোগিতা অনস্বীকার্য। কিন্তু এতদিন পরেও সেগুলিকে এইভাবে আঁকড়ে রাখার উপযোগিতা কতটুকু তা অবশ্যই খোলা মনে ভাবা দরকার। এই সব ধর্মের লোকেরা দৈনন্দিন জীবনে অনেককিছুই পাল্টে ছেন; তখনকার পোষাক, তখনকার ঘরবাড়ি, তখনকার ব্যবহার্য বস্তু ইত্যাদি সব ক্ষেত্রেই কম বেশি পরিবর্তন ঘটেছে। কিন্তু ধর্মের নাম করে প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করা তখনকার কোন নিয়মকানুন পাল্টানোর কথা বললেই, তাঁরা হাস্যকরভাবেই ভাবতে শুরু করেন, ধর্ম শেষ হয়ে গেল তথা নিজেদের ধর্মীয় অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়ল।

তথাকথিত ঐ বিয়ে এবং প্রাকবিবাহ যৌনতার ক্ষেত্রেও এই ধরনের পরিবর্তন এসেছে। আর এ ক্ষেত্রেও তথাকথিত এই বিবাহকে যতই মহৎ-মহীয়ান করা হোক না কেন, তার মধ্যে যৌনতা ও প্রজননের দিকটিই প্রধান। এবং এটিও বাস্তব সত্য যে, বিয়ের ছাড়পত্র নিয়ে, বিশেষত নারীর (স্ত্রীর!) উপর যে যৌন নিপীড়ন চালনো হয় তা বিবাহ প্রথার ঐ তথাকথিত পবিত্রতার কঙ্কালটাকে উন্মুক্ত করে দেয়। ঐ প্রসঙ্গে বার্টান্ড রাসেলের এই মন্তব্য স্মরণ করা যায়—

"বিবাহ হল মেয়েদের সবচেয়ে প্রচলিত জীবিকা অর্জনের উপায়। বিয়ের ক্ষেত্রে মেয়েদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যে পরিমাণ যৌনতা সহ্য করতে হয়, সম্ভবত বেশ্যাবৃত্তিতেও তা হয় না।"

এবং পরিবারের ঘেরাটোপের মধ্যে, শোয়ার ঘরের চার দেওয়ালে বহু নারীকেই তা সহ্য করতে হয়। এক্ষেত্রে শিক্ষিত-অশিক্ষিত দরিদ্র-স্বচ্ছল নির্বিশেষেই তা কমবেশি ঘটে।

বিবাহপ্রথা নিঃসন্দেহে মানুষের তৈরি করা কৃত্রিম একটি ব্যবস্থা। মানবেতর প্রাণীদের মধ্যে তা নেই, তার প্রয়োজনও হয়নি এবং এই কারণে তাদের বিলুপ্তিও ঘটে নি। কিন্তু মানুষ তার সমাজ তৈরি করেছে, তারও শুরুর দিকে বিবাহপ্রথা বলতে কিছু ছিল না। পরবর্তীকালে মূলত ব্যক্তিগত সম্পত্তির সঠিক উত্তরাধিকারী নির্ণয়ের জন্য বিবাহপ্রথার জন্ম। দীর্ঘদিনের অভ্যাসে তা বহু মানুষের মানসিক অনুমোদনও পেয়েছে। পাশাপাশি সামাজিক শৃঙ্খলারক্ষা, অবাধ যৌনতার নিয়ন্ত্রণ, নারীর বহুভোগ্যা হওয়ার মত পরিস্থিতির পরিবর্তন, বিশেষত নারীর সুরক্ষা, নারী-পুরুষের পারস্পরিক সহমর্মিতা ও মানসিক সংযোগের পরিবেশ সৃষ্টি ইত্যাদির মত ইতিবাচক দিকগুলিও এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেছে।

কিন্তু কেউ এই ধরনের কৃত্রিম সামাজিক ব্যবস্থার সমস্ত ইতিবাচক দিক সত্ত্বেও যদি তা অনুসরণ না করে, তবে তাতে মহাসর্বনাশ হয়ে গেল বা সেটি অধর্মীয় একটি কাজ বলে ভাবার কোন কারণ নেই। পুরুষ ও নারীর পারস্পরিক ভাললাগা ও ভালোবাসা, সঙ্গে পরস্পরের সম্মতি সাপেক্ষে যৌনমিলন, চাইলে এমনকি সন্তানের জন্ম দেওয়াও— এটিই প্রজাতি হিসেবে প্রাথমিক দিক। কিন্তু এক্ষেত্রে প্রধান বাধা মানুষের তৈরি করা সমাজ, তথা সামাজিক কিছু তথাকথিত মূল্যবোধ ও অনুশাসন। একইসঙ্গে সমাজের অবচেতনে থাকে ব্যক্তিগত সম্পত্তি তথা শ্রেণীস্বার্থ বিপর্যস্ত হওয়ার ভয়ও। তাই প্রাক্‌বিবাহ বা বিবাহবহির্ভূত যৌনতার বিরুদ্ধে সমাজ খড়্গহস্ত হয়ে ওঠে। এই খড়্গকে সামাল দিতে পারার সাহস দেখিয়ে বর্তমানে বিশ্বে অনেকেই প্রচলিত বিবাহ বহির্ভূত যৌনতার আশ্রয় নিয়েছেন (যেমন একক মাতৃত্ব, লিভ্‌ টুগেদার ইত্যাদি)। এর মধ্যে অপরাধ কিছু নেই; বরং উচ্ছৃঙ্খল যৌনতা, বিকৃতকামী বহুগামিতা, অন্যের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার চেয়ে তা অনেক সুস্থ ব্যাপার। এবং প্রেমহীন, ভালোবাসাহীন দাম্পত্যের বোঝা বয়ে চলা, যান্ত্রিক যৌনতা, কৃত্রিম যৌন অবদমন এসবের চেয়েও প্রাক্‌বিবাহ যৌনতা বা বিবাহ-সম্পর্কের বাইরে প্রেমময় যৌন সম্পর্ক অনেক বেশি কাম্য। আর এ ক্ষেত্রে এটিও মনে রাখা

প্রয়োজন যে, অপ্রাপ্তবয়স্কদের যৌনতাকে কিন্তু ঐ মাত্রায় সুস্থ ও কাম্য বলা যায় না মূলত শারীরিক বিপদ, আবেগগত জটিলতা ও ভবিষ্যৎজীবন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি,— এসব কারণেই।

প্রাক্‌বিবাহ যৌনতার সামাজিক ভ্রূকুটি আবার বেশি সহ্য করতে হয় মেয়েদের, বিশেষত ভারতবর্ষের মত আধা সামন্ততান্ত্রিক মানসিকতার পরিমণ্ডলে। এক্ষেত্রে নারী শরীরকে পবিত্র হিসেবে ভাবার ও সতীত্ব সম্পর্কিত কুসংস্কার বিরাট ভূমিকা পালন করে। নারী বা পুরুষ—যারই হোক না কেন, নিজ শরীরের উপর এবং নিজস্ব আবেগ-ভালোবাসার উপর তার নিজেরই অধিকার । তার রুচিতে না বাধলে, অন্যের ক্ষতি না করে নিজের শরীরকে নিজের মত করে ব্যবহার সে করতেই পারে। কিন্তু বিশেষ করে মেয়েদের মন নয়, তার শরীর তথা তার সতীত্ব ও 'সতীচ্ছদ' (hymen)-কে এদেশের অধিকাংশ মানুষই (পুরুষ মানুষ!) বড় বেশি গুরুত্ব দেয়। কিন্তু ঘোমটার আড়ালে খ্যামটা নাচ চলেই। এদেশের রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণ-এর মত প্রাচীন সাহিত্যেই ছড়িয়ে আছে দেবদেবী মুনিঋষিদের প্রাক্ বিবাহ যৌনতা, বিবাহ বহির্ভূত যৌন সম্পর্ক আর অবাধ যৌনতার গল্প।

আসলে একদিকে নারী-শরীরকে পুরুষের ভোগ্যবস্তু বা খাদ্যদ্রব্য—যেন পাকা ফলের মত—ভাবা হয়। কোথাও একটা খুঁত থাকলে তা বর্জনীয়; অন্যদিকে আছে বিবাহ নামক পদ্ধতির আরোপিত পবিত্রতা—বিয়ের ছাপ থাকলে কোনো নারী মা হলে সে চরম পূজনীয়া দেবী, আর না থাকলে সে ঘৃণ্য অসতী নিন্দনীয়। আর বিবাহিতা নারী বা বিবাহিত পুরুষ ভালোবাসার কোন পুরুষ বা নারীকে সম্মতি সাপেক্ষে ও দায়িত্ব সহকারে গ্রহণ করলেও সে হয়ে যায় ব্যভিচারিণী বা ব্যভিচারী।

এই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গী হয় তো সবটা পাল্টানো মুস্কিল। তবে আশার কথা বিশ্বজুড়েই তা পাল্টাচ্ছে। কৃত্রিম সামাজিক অনুশাসনের কড়াকড়ি আগে তো এতটা ছিলই না। পরবর্তীকালে তা জোর করে গ্রহণযোগ্য করা হয়েছে,—হয়তো ব্যক্তিগত সম্পত্তির সৃষ্টি ও সুরক্ষার তথা সুনিশ্চিত উত্তরাধিকারী নির্ণয়ের মত অর্থনৈতিক প্রয়োজনে। কারণ একমাত্র নারীই জানে কোন্ পুরুষের সঙ্গে যৌনমিলনে তার সন্তানের জন্ম এবং মাতৃ পরিচয়ে কোন সন্দেহই থাকে না, কারণ মায়ের শরীর থেকেই সরাসরি সন্তানের জন্ম হচ্ছে; কিন্তু ঐ নারী যদি বহু পুরুষের সঙ্গে মিলিত হয় তবে সন্তানের পিতৃত্ব নারীর সাক্ষ্য দ্বারাই নির্ধারিত হয়। দ্রৌপদীর পঞ্চ স্বামী থাকলেও, তাঁকে এক একজনের সঙ্গে সুনির্দিষ্ট আলাদা আলাদা সময়কাল ধরেই কাটাতে হত, একই ঋতুচক্রে একাধিক স্বামীসঙ্গ করার সুযোগ দেওয়া হয়নি।

কিন্তু আগামী বিশ্বে সম্পত্তি সুরক্ষার জন্য সঠিক উত্তরাধিকারী রেখে যাওয়ার তাগিদটাই কমে যাবে, এখনি যার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। আগে যখন সন্তানের অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্যের নিশ্চয়তা ছিল না, তখন তার প্রয়োজন ছিল। পাশাপাশি ছিল নিজের প্রাপ্ত বা অর্জিত

সম্পদের প্রতি অন্ধ মোহ। বর্তমানে সন্তান-সন্ততির স্বাচ্ছন্দ্যের অনিশ্চয়তা অনেকের ক্ষেত্রেই কমছে। সন্তানরাও নিজের জোরে অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য অর্জন করতে পারছেন। ফলে পূর্বপুরুষের রেখে যাওয়া সম্পদের উপর নির্ভর করে আলস্যে জীবন কাটানোর প্রবণতা ক্রমহ্রাসমান। ভবিষ্যতে সমাজ ও অর্থনীতির বৈপ্লবিক বিকাশের ফলে যদি পৃথিবীর প্রতিটি নাগরিকের সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য ন্যূনতম হয় এবং স্বাচ্ছন্দ্য সুনিশ্চিত হয়, তবে আর এইভাবে সঠিক উত্তরাধিকারী নির্ণয় করার প্রবণতা আর ব্যক্তিগত সম্পদের পাহাড় জমিয়ে তার প্রতি মায়া ও মোহ—এসবও প্রায় বিলুপ্ত হবে। তখন একই সঙ্গে প্রচলিত প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম, ধর্মীয় অনুশাসন, অস্তিত্বহীন দেবদেবী ও অলৌকিক শক্তির উপর নির্ভরতা—এসবেরও প্রয়োজন বিলুপ্ত হবে। মানুষ নিজে হবে নিজেরই নিয়ন্তা। ঐ সমাজে নারী-পুরুষ উভয়েই তার শরীর ও মনের উপর নিজ অধিকার পরিপূর্ণভাবে প্রয়োগ করতে ও উপভোগ করতে পারবেন। স্বাধীন নারী ও পুরুষ নিজের ভালোলাগা ভালোবাসা, নিজের রুচি ও প্রয়োজন—এসবের সঙ্গে সমাজের অন্য সবার প্রয়োজন ও স্বার্থকে সম্পৃক্তভাবে সংযুক্ত করে জীবন কাটাবেন। ঐ সমাজে অপরিণতবয়সে তথা বয়ঃসন্ধির সময় অবাধ শৃঙ্খলাহীন যৌনতার ব্যাপারে মানুষ হবে সতর্ক। বিজ্ঞানমনস্ক ও বৈজ্ঞানিক মূল্যবোধে শিক্ষিত ঐ মানুষের কাছে প্রাক্‌বিবাহ যৌনতাকে নিন্দনীয় ভাবার মানসিকতাই হবে হাস্যকর ও অপ্রাসঙ্গিক।

তখন নারী-পুরুষের সম্পর্কের মধ্যে প্রধান দিক হবে পারস্পরিক ভালোবাসা ও প্রেম, পারস্পরিক প্রয়োজন ও দায়িত্ববোধ। প্রেমহীন সম্পর্ককে টিকিয়ে রাখার জন্য আইন বা অনুশাসন যেমন ভূমিকা রাখবে না, তেমনি প্রেমময় সম্পর্কের ক্ষেত্রেও রাষ্ট্র বা সমাজ বাধা হয়ে দাঁড়াবে না।

যতদিন তা না হচ্ছে ততদিন এই ভালোবাসায় ভরা প্রাক্‌বিবাহ বা বিবাহ বহির্ভূত যৌনতার উপর ভ্রূকুটি নামবেই। মুক্তমনা সচেতন নারী-পুরুষ ঐ ভবিষ্যতের জন্য লড়াই করার পাশাপাশি এই ধরনের ভ্রূকুটির বিরুদ্ধেও লড়াই করে যাবেন।

(৭)

উচ্ছেদ হোক 'সতীচ্ছদ'

নারীর যোনিমুখে একটি পাতলা পর্দা (mucous membrane) থাকে। একে বলা হয় 'সতীচ্ছদ' (hymen)। শুধু উপস্থিত থাকা ছাড়া এর আর কোন কাজ নেই। কিন্তু পুরুষেরা এর একটি মনগড়া কাজ আবিষ্কার করেছে, সেটি হল মেয়েদের তথাকথিত 'সতীত্ব' রক্ষা করা বা সতীত্বের লক্ষণ হিসেবে ভূমিকা পালন করা। এর পেছনেও যে ভুল ধারণাটি ভূমিকা পালন করে, সেটি হল এই যে একমাত্র প্রথম যৌনমিলনেই লিঙ্গের আঘাতে এটি ছিন্ন হয় এবং রক্তপাত ঘটে। কিন্তু এটি সম্পূর্ণ ভুল ধারণা এবং নিষ্কর্মা এই পর্দাটির নামের সঙ্গে 'সতী' বা 'সতীত্ব' জাতীয় শব্দ সংযুক্ত রাখাটা এক ধরনের কুসংস্কারের পর্যায়েই পড়ে।

তথাকথিত সভ্যসমাজে পুরুষরা নারীদের যে ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসেবে গণ্য করে তার আরেকটি স্থূল বহিঃপ্রকাশ ঘটে, নারীদের এই সতীত্ব সম্পর্কে কিছু ধারণার মধ্য দিয়ে। পুরুষদের বহুগামিতা প্রায়শঃই নিন্দনীয় নয় বা ক্ষমার্হ, কিন্তু নারীদের ক্ষেত্রে এটি একটি অমার্জনীয় অপরাধ। বহু আদিবাসী গোষ্ঠী ও জন্তু জানোয়ারদের মধ্যে এ ব্যাপারটি না থাকলেও, সভ্যতার নাম করে তথাকথিত সভ্য মানুষের মধ্যে এটি ব্যাপকভাবে প্রতিষ্ঠিত। নারী-পুরুষ উভয়েরই উচ্ছৃঙ্খল যৌনতা বা প্রেমহীন বহু-গামিতাকে প্রশ্রয় না দিয়েই বলা যায় যে, এ ধরনের মানসিকতা নারী-পুরুষ উভয়ের ক্ষেত্রেই একই ধরনের হওয়া উচিত। আর সতীত্বের এ ধারণা সৃষ্টি ও চাপিয়ে দেওয়ার পেছনেও ব্যক্তিগত সম্পত্তির সৃষ্টি ও নির্দিষ্ট উত্তরাধিকারী সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার ইচ্ছাই কাজ করেছে। কারণ সদ্যোজাত কোন সন্তানের 'মা কে?' এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ থাকে না; কিন্তু 'বাবা কে?' এর উত্তর একমাত্র মা-ই জানে।

সতীত্ব প্রসঙ্গে প্রথম যৌন মিলনের সময় সতীচ্ছদ (hymen) পরীক্ষার প্রবণতার কথা বলা যায়। নারীদের যোনিমুখে এই পাৎলা আবরণীটি না থাকলে ও প্রথম যৌনমিলনে এটি ছিঁড়ে রক্তপাত না হলে ঐ নারীকে অসতী হিসেবে গণ্য করা হয়---এমনকি সদ্য বিবাহিতা স্ত্রীকে এর জন্য পরিত্যাগ করার ঘটনাও ঘটে। অর্থাৎ ভাবা হয়, মেয়েটির যেন আগে কারোর সঙ্গে যৌন মিলনের অভিজ্ঞতা হয়েছে।

কিন্তু এই সতীচ্ছদ অনেক নারীর ক্ষেত্রে জন্ম থেকে স্বাভাবিকভাবেই অনুপস্থিত থাকতে পারে। এছাড়া কোন দুর্ঘটনায়, মাসিকের সময়, খেলাধূলা বা সাইকেল চালানর সময় ইত্যাদি নানাভাবে এটি ছিঁড়ে যেতে পারে। সবচেয়ে বড় কথা কুমারী মেয়েদের এই

সতীচ্ছদেও স্বাভাবিকভাবেই এক বা একাধিক ছোড়-বড় ছিদ্র থাকে যার ফলেই মাসিকের সময় রক্ত বিনা বাধায় বাইরে বেরিয়ে আসতে পারে। এই ছিদ্র স্বাভাবিকভাবেই বড় থাকলে প্রথম বা পরবর্তী যৌনমিলনেও সতীচ্ছদটি আদৌ না ছিঁড়তে পারে। [বিরল ক্ষেত্রে আবার এই পর্দায় কোন ছিদ্র নাও থাকতে পারে (imperforate hymen)। তখন প্রয়োজনে অস্ত্রোপচার করে এই ত্রুটি দূর করতে হয়।]

এছাড়া সতীচ্ছদে রক্ত সরবরাহ যথেষ্ট কম (relatively avascular)। তাই যৌনমিলনে এটি অল্প পরিমাণে ছিঁড়লে আদৌ রক্তপাত নাও ঘটতে পারে। একমাত্র শিশুর জন্মের সময় অর্থাৎ প্রসবের সময়ই মায়ের এই তথাকথিত সতীচ্ছদটি সম্পূর্ণরূপে ছিঁড়ে যায়। ছিঁড়ে যাওয়ার পর ছোট ছোট গুটির আকারে এর অবশেষ (carunculae hymenales) থেকে যায়।

স্পষ্টতঃই সব মিলিয়ে 'সতীচ্ছদ' এই কথাটিই সম্পূর্ণ ভুল---ছিন্ন হয়ে এর থেকে রক্তপাত হওয়া তথাকথিত সতীত্বের আদৌ কোন পরিচায়ক নয়। বড় জোর পঞ্চাশভাগ কুমারীর ক্ষেত্রে ব্যাপারটি ঘটতে পারে। প্রাচীনকালে অসম্পূর্ণ জ্ঞানের ফলে, সতীত্ব পরীক্ষার সংকীর্ণ মানসিকতা এবং ভ্রান্ত ধারণা থেকেই 'সতীচ্ছদ' কথাটির সৃষ্টি। গ্রীক শব্দ hymen-এর অর্থ পাৎলা পর্দা (membrane)। বাংলায় এটিকে যোনি-পর্দা বলা যায়; কিন্তু 'সতীচ্ছদ' আদৌ নয়। তাই সতীচ্ছদ শব্দটিরই উচ্ছেদ হওয়া দরকার। অভিধানে থাকলেও তার ব্যাখ্যায় সতীত্ব সম্পর্কিত ভুল ধারণা থেকেই যে এই শব্দটির সৃষ্টি তার উল্লেখ থাকা উচিত।

(৮)

হস্তমৈথুন কি পাপ?

যৌন তৃপ্তি বা আনন্দ লাভের উপায় হিসেবে হস্তমৈথুন নিঃসন্দেহে একটি অস্বাভাবিক প্রক্রিয়া। নারীপুরুষের স্বাভাবিক যৌনমিলনের বাইরে সমকামিতা ছাড়া এই হস্তমৈথুনই আরেকটি উপায় যার সাহায্যে যৌন-অতৃপ্তির হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। কিন্তু যেহেতু এটি স্বাভাবিক পদ্ধতি নয়, তাই তার ওপর নানা ধরনের ধর্মীয় ও সামাজিক বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে। হিন্দু থেকে খৃস্ট—প্রায় সব ধর্মেই হস্তমৈথুনকে পাপ কাজ হিসেবে এবং এর ফলে শরীরের ভয়ংকর ক্ষতির কথা বলা হয়েছে। অবশ্য সরাসরি খুব কম ধর্মগ্রন্থেই হস্তমৈথুন নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। হস্তমৈথুনের বিষয়টি তবু ধর্মীয় আচার-আচরণের মধ্যে একটি নিন্দার্হ কর্ম বলেই চিহ্নিত হয়েছে। যেমন বাইবেলে হয়তো এনিয়ে কিছু বলা হয়নি। কিন্তু ১৯৭৫ সালের ২৯ ডিসেম্বর ভ্যাটিকান সিটি থেকে খৃষ্টানদের জন্য প্রচারিত 'Declaration on Sexual Ethics'-এ বলা হয়েছে, 'হস্তমৈথুন মূলগতভাবে একটি ভয়ানক অস্বাভাবিক কাজ। যদিও ধর্মগ্রন্থে বিষয়টিকে পাপ হিসাবে নিন্দা করা হয় নি, তবু চার্চের ঐতিহ্য অনুসারে নতুন টেস্টামেন্টের আলোকে সঠিক সিদ্ধান্ত এই যে—কৌমার্য ও আত্মসংযমের বিপরীতে তা অশুচিতা ও কৌমার্য-ভঙ্গের অনুরূপ।'

ধর্মীয় রক্ষণশীলতায় যৌনক্রিয়াকর্মই প্রায়শঃই নিন্দিত হয়েছে। অবশ্য এর অর্থ এ নয় যে ঐ ধর্মীয় রক্ষণশীলতার প্রচারক বা প্রচারিকারা সবাই যৌনক্ষমতাহীন বা যৌনআবেগহীন। আসলে সুস্থ কোন নারী-পুরুষের পক্ষেই যৌন আকাঙ্খা ছাড়া ও যৌন তৃপ্তি লাভের জন্য কোন পদ্ধতি অবলম্বন না করে থাকা সম্ভব নয়। স্বাভাবিক শারীরিক-মানসিক গঠনের সম্পৃক্ত অংশ এই যৌনতা বা যৌন-আকাঙ্খা, —ক্ষুধা-তৃষ্ণা-শ্রম-বিশ্রাম ইত্যাদির মতই। ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শ্রম বা বিশ্রাম —এদের কোনটিই যেমন খুব কম বা খুব বেশি হলে শরীরের তথা সমাজের পক্ষে ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়ায়, একইভাবে ক্ষতিকর খুব কম বা খুব বেশি, যৌন কর্মকান্ডও।

হস্তমৈথুনের ক্ষেত্রেও তা সত্যি। হস্তমৈথুন যদি কারোর নেশা হয়ে যায়, বারবার হস্তমৈথুন না করে কেউ যদি না থাকতে পারে,—তবে অবশ্যই তা ব্যক্তি বিশেষের সুস্থ মানসিক গঠন ও সুস্থ পারিবারিক জীবনের পরিপন্থী। এই ধরনের ব্যক্তিরা (বিশেষত তরুণ-তরুণীরা) জীবনের সুস্থ স্বাভাবিক কাজকর্মে আগ্রহ হারিয়ে ফেলে, মেজাজটা হয় খিটখিটে, স্বাভাবিকভাবে অন্যের সঙ্গে মেলা মেশা করে না বা করতে পারে না, একা থাকতে ভালবাসে, চোখের নীচে কালি পড়তে থাকে, লাজুক ও ভীরু স্বভাবের হয়ে

যায়। হস্তমৈথুনে আসক্ত অনেক তরুণ-তরুণীদের মধ্যে একাগ্র হয়ে কোন কাজ করার ক্ষমতা কমতে থাকে, যে কারণে ঠিকমত পড়াশুনা করতে পারে না, মনে রাখার ক্ষমতাও বিপর্যস্ত হতে থাকে। কারো কারোর মধ্যে বদহজম, কোষ্ঠবদ্ধতা দেখা দেয়। কারোর বা মাঝেমাঝে কানে ভোঁ ভোঁ আওয়াজ হতে থাকে। ক্রমশ শরীরের স্বাভাবিক ঔজ্জ্বল্য ও লাবণ্য কমে যায়। শারীরিক দুর্বলতা ও মানসিক সাহসের অভাব দেখা দেয়। দীর্ঘদিন ঘন ঘন হস্তমৈথুন করার ফলে এক সময় মূলত মানসিক কারণে বিশেষত তরুণদের মধ্যে লিঙ্গ শিথিল হয়ে যায় ও প্রকৃত যৌনমিলনের জন্য লিঙ্গের প্রয়োজনীয় দৃঢ়তা আসে না। ফলে পরবর্তীকালে স্বাভাবিক যৌন মিলন ও যৌনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে যায় । এই ধরনের পুরুষরা এক সময় যৌন মিলন থেকে যৌন আনন্দ পায় না, সঙ্গিনীকে যৌন তৃপ্তিও দিতে পারে না।

অন্যথায় সীমিতভাবে মাঝে মাঝে হস্তমৈথুনের মাধ্যমে যৌন আনন্দ পাওয়ার ব্যাপারটা ক্ষতিকর কিছু নয়। বরং তার শারীরিক-সামাজিক উপযোগিতাও রয়েছে। যৌন তৃপ্তির ব্যাপারটা যে কোন পূর্ণবয়স্ক মানুষেরই অন্যতম স্বাভাবিক শারীরিক ও মানসিক চাহিদা। তাই অবিবাহিতদের ক্ষেত্রে মাঝেমাঝে হস্তমৈথুনের ফলে যৌন তৃপ্তি পাওয়াটা মানসিক প্রশান্তি নিয়ে আসে এবং বেশ্যাগৃহে যাওয়া বা অন্যান্য মহিলাদের ধর্ষণ করার প্রবণতা কমাতে সাহায্য করে। এর ফলে পরোক্ষভাবে যৌনরোগ ও এইডস-এর মত রোগের প্রসারও কম হয়। মেয়েদের মধ্যে হিস্টেরিয়ার মত মনোরোগ প্রতিরোধেও তা কাজ করে। শুধু অবিবাহিতদের মধ্যেই নয়, বিবাহিত যে সব পুরুষ বা নারী নানা কারণে সঙ্গিনী বা সঙ্গীর থেকে দূরে থাকতে বাধ্য হয়, তাঁদের মধ্যেও এইভাবে মাঝে মাঝে যৌনতৃপ্তি পাওয়াটা ব্যভিচারিতা, উচ্ছৃঙ্খলতা ও অন্যান্যদের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ার ব্যাপারটা আটকাতে সাহায্য করে। এর ফলে যৌনতৃপ্তি তথা মানসিক প্রশান্তি শুধু নয়, দাম্পত্য জীবনের স্বাভাবিক ধারাবাহিকতাও রক্ষিত হয়। সব মিলিয়ে সীমিতভাবে হস্তমৈথুন দোষাবহ, ক্ষতিকর বা নিন্দার্হ কিছু তো নয়ই,—বরং তা শারীরিক, মানসিক, সামাজিক সব দিক থেকেই ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে। এবং বর্তমানে এইডস-এর মত মারণ রোগের প্রতিরোধের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ উভয়েরই সীমিত হস্তমৈথুন পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষভাবে বিরাট ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে।

সত্যি কথা বলতে কি, যৌনআকাঙ্খা ও তাকে পরিতৃপ্ত করার তাগিদ শুধু, মানুষের নয়, পশুদেরও আছে এবং এ কারণে 'হস্তমৈথুন' জাতীয় (যেহেতু তাদের হস্ত নেই) প্রক্রিয়ায় যৌনমিলন ছাড়া যৌনতৃপ্তি পাওয়ার ব্যাপারটা প্রাণীদের মধ্যেও দেখা যায়। যেমন পাশ্চাত্যের কিছু গবেষক (যেমন Ford & Beach) দেখেছেন, গৃহপালিত ঘোড়া নিজের পেটের উপর জননেন্দ্রিয় ঘর্ষণ করে যৌনতৃপ্তি পায়, ষাঁড় ও গাধা পশ্চাদ্দেশ উঁচু-নীচু করে সামনের পায়ের সাহায্যে নিয়ে বীর্যপাত করে। গাধা নাকি নিজের মুখেও লিঙ্গ দিয়ে আনন্দ পাওয়ার চেষ্টা করে। হাতি তার পেছনের পা দুটির মধ্যে যৌনাঙ্গ

চেপে যৌন তৃপ্তি লাভ করে। অন্য দিকে পুরুষ বানরদের মধ্যে মানুষের মত হাত ব্যবহার করে হস্তমৈথুন করার ঘটনাও লক্ষ্য করা গেছে। অর্থাৎ এটি স্পষ্ট যে, হস্তমৈথুনের ব্যাপারটা যৌনচেতনা সম্পন্ন সবার ক্ষেত্রেই আছে। তবে মানুষের মধ্যে এই প্রবণতা হয়তো কিছুটা বেশি। এ ব্যাপারে প্রখ্যাত গবেষক, ডঃ কিনসে (Dr. Alfed C. Kinsey) পরিসংখ্যানগত ভাবে দেখিয়েছেন যে, শতকরা ৮২ ভাগ তরুণ ও ২০ ভাগ তরুণী হস্তমৈথুনে চরম আনন্দ লাভ করে। আরেক গবেষক সরেন্সন (Sorenson) ১৯৭৩ সালে পরিচালিত একটি সমীক্ষায় দেখেছেন, শতকরা ৫৮ জন পুরুষ ও ৩৯ জন মহিলার হস্তমৈথুনের অভিজ্ঞতা আছে। তবে আপাতভাবে মনে হয় এই পরিসংখ্যান সম্পূর্ণ নয়। বিশেষত পুরুষদের মধ্যে হস্তমৈথুনের অভিজ্ঞতার হার যথাসম্ভব আরো বেশি। আর পশুদের মধ্যে এই ধরনের কোন পরিসংখ্যানভিত্তিক সমীক্ষার কাজ জানা নেই।

যাই হোক এটি ঘটনা যে মানুষ থেকে মনুষ্যেতর প্রাণী—সবার মধ্যেই হস্তমৈথুন অন্যতম একটি যৌনক্রিয়া। অথচ নীতিবাগিশেরা, ধর্মতত্ত্ববিদেরা ও রক্ষণশীল মানসিকতার কিছু মানুষ হস্তমৈথুন সম্পর্কে লাগাতার এত বেশি অবৈজ্ঞানিক অপপ্রচার চালিয়েছেন যে, অনেকের মধ্যে এ ব্যাপারে কিছু কুসংস্কারের সৃষ্টি হয়েছে। অনেকে হস্তমৈথুন দু' একবার করে ফেলার পর মিথ্যা অপরাধবোধে ভুগতে থাকে, যা অনেকের মধ্যে তীব্র হয়ে মনোরোগ,যৌন অক্ষমতা ইত্যাদির জন্ম দেয় ও বিপদ ডেকে আনে।

যেমন আমাদের দেশে একটি প্রচলিত বিশ্বাস এই যে, পুরুষের বীর্য হচ্ছে শরীরের সবচেয়ে সেরা জিনিষ, যেন 'জীবনীশক্তির' নির্যাস। তাই হস্তমৈথুনের মত অস্বাভাবিক যৌনক্রিয়ায় অহেতুক বীর্যক্ষয় করা হলে শরীরেরই নাকি বিনাশ ঘটে। শুধু আমাদের দেশেই নয়, পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই পুরুষের বীর্য নিয়ে এই ধরণের মিথ্যা বিশ্বাস প্রচলিত আছে। কোন কোন স্থানে তা আবার চূড়ান্ত অবিজ্ঞানের রূপ নেয়। যেমন সুইজারল্যান্ডে ডাঃ এস টিসট (Dr. S. Tissot; 1728-1797) নামে এক চিকিৎসক অষ্টাদশ শতাব্দীতে রীতিমত জোরগলায় প্রচার করেন যে, সমস্ত ধরনের যৌনক্রিয়াই অত্যন্ত মারাত্মক ও মানুষের পক্ষে ক্ষতিকর এবং যৌনক্রিয়ার সময় দেহের রক্ত মাথায় উঠে যায় ও শরীরের অন্যান্য অঙ্গের জন্য আর সামান্য রক্তই অবশিষ্ট থাকে, ফলত যৌনক্রিয়ার ফলে মস্তিষ্ক ও স্নায়ু সমূহ এবং অন্যান্য অঙ্গ ক্রমাগত ক্ষয় পেতে থাকে। তাঁর মতে যৌবনের শুরুতে অনেকেযে হস্তমৈথুন শুরু করে তা শরীর স্বাস্থ্যের প্রচন্ড ক্ষতি করে। এমন কি এর থেকে স্মৃতিভ্রংশ, উন্মাদরোগ, বা পাগলামি, প্রায় সমস্ত ধরনের শারীরিক মানসিকরোগ বা শারীরিক দুর্বলতা ইত্যাদিও নাকি হতে পারে। আমেরিকার বিখ্যাত চিকিৎসক ডাঃ বেঞ্জামিন রাশ (Dr. Benjamin Rush) তো এক সময় আমেরিকার 'স্বাধীনতা ঘোষণা পত্র' (Declaration of Independence)-এর সঙ্গে হস্তমৈথুনের বিরুদ্ধেও ব্যাপক প্রচার চালান।

এসবের ফলশ্রুতিতে সাধারণ মানুষ তো বটেই অনেক চিকিৎসকও হস্তমৈথুনকে অত্যন্ত ক্ষতিকর একটি ব্যাপার হিসেবে ধরে নিয়ে কমবয়সী ছেলেমেয়েদের এর হাত থেকে

রক্ষা করার জন্য নানাবিধ উপায় অবলম্বন করতে থাকেন এবং বিভিন্ন ধরনের উপদেশ দিতে থাকেন। বাবা-মায়েরা সন্তানের ঐ ' ছোট্ট মহামূল্যবান অঙ্গ'-টির সুরক্ষার জন্য চিকিৎসকদের শরণাপন্ন হতে থাকেন। হস্তমৈথুন আটকাতে (সঙ্গে 'কৌমার্য' রক্ষা করতেও) চিকিৎসকরা নানা ধরনের বেল্ট, খাঁচা, তালাদেওয়া কোমরবন্ধনী ইত্যাদির ব্যবস্থপত্র দেওয়া শুরু করেন। আমেরিকার পেটেন্ট অফিসে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকেও সতীত্ব-বন্ধনী (chastity belt)-এর পেটেন্ট চালু ছিল। হস্তমৈথুন আটকাতে ছেলেদের লিঙ্গে জোঁক লাগিয়ে রেখে রক্তক্ষরণ করানো হত। আরো ভয়াবহ হল, ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে, ছেলে ও মেয়েদের হস্তমৈথুন আটকানোর জন্য বা তার চিকিৎসার জন্য আমেরিকায় তখন যে অবিশ্বাস্য নিষ্ঠুর 'চিকিৎসা' করা হত তা হল ছেলেদের শুক্রাশয়ছেদন (castration) ও মেয়েদের ভগাঙ্কুরছেদন (Clitoridectomy)। বর্তমানে প্রচলিত কিছু ধর্মীয় গোষ্ঠীর ছেলেদের লিঙ্গমুন্ডআবরণী ত্বকের ছেদন তথা সুন্নৎ বা খৎনা করার ব্যাপারটি হয়তো এই ধরনের চিকিৎসারই একটি পরিবর্তিতরূপ। অন্যদিকে বিশেষ কিছুখাবার দাবারকেও যৌন উত্তেজক বলে মনে করা হত। যেমন মাখন, মাছ, মাংস, ডিম, দুধ, মদ, মশলা, কফি, লঙ্কা, জেলি, চকোলেট ইত্যাদি। তাই অবিবাহিত তরুণতরুণীদের ' যৌন উত্তেজনা' তথা হস্তমৈথুন করার প্রবণতা আটকানোর উদ্দেশ্যে তাদের এই ধরনের পুষ্টিকর, রুচিকর খাবার দাবার খেতে দেওয়া হত না। (আমাদের দেশে এ ধরনের মিথ্যা ধারণা এখনো আছে; বিধবাদের জন্য মাছ-মাংস-পেঁয়াজ-রসুন ইত্যাদি নিষিদ্ধ করার পেছনেও তাঁদের মধ্যে যাতে যৌন উত্তেজনা না জাগে তার চেষ্টাই প্রধান ভূমিকা পালন করে।) এখন অবিশ্বাস্য মনে হলেও, ১৮৯৬ সালে 'নিউইয়র্ক মেডিক্যাল টাইম্স্'-এই ডাঃ ডব্লু. এফ. মরগান (Dr. W. F. Morgan) তাঁর প্রবন্ধে স্পষ্টভাবে বলেছিলেন, তরুণ-তরুণীরা ডিম, মাখন, অ্যাসপারজিলাস (শতমূলী জাতীয় কন্দ) ইত্যাদি খেলে তাদের মধ্যে হস্তমৈথুন ও স্বপ্নদোষ বৃদ্ধি পাবে। এবং বিংশ শতাব্দীর গোড়া অব্দিও এই সব ধারণার রেশ ছিল। মনে করা হত দড়ি বেয়ে ওঠা, সাইকেল চালানো, সেলাই মেশিন চালানো ইত্যাদির ফলে যৌন উত্তেজনা ঘটে এবং হস্তমৈথুন করার ইচ্ছা জাগে। আরো মনে করা হত, হস্তমৈথুনের ফলে অকাল বার্ধক্য, স্মৃতি ও দৃষ্টিশক্তির হ্রাস, শারীরিক দুর্বলতা ও অক্ষমতা থেকে শুরু করে পাগল হয়ে যাওয়ার ঘটনা ঘটতে পারে।

কিন্তু এখন জানা গেছে, নিয়ন্ত্রিত হস্তমৈথুনের ফলে এসব কিছুই ঘটে না, বরং তা ব্যক্তি ও সমাজ সবার ক্ষেত্রেই উপকারী ভূমিকা পালন করতে পারে, যেমন আগেই বলা হয়েছে। অবশ্য অতিমাত্রায় হস্তমৈথুন তথা হস্তমৈথুনে আসক্তি অবশ্যই ক্ষতিকর,—যে ব্যাপারেও আগে আলোচনা করা হয়েছে। যে কোন কিছুর প্রতিই মাত্রাতিরিক্ত আগ্রহ বা আসক্তিই কোন না কোনভাবে ক্ষতিকর। এই হস্তমৈথুনে আসক্তি অবশ্য শুধুমাত্র বিশেষ ব্যক্তির নিছক যৌন আকাঙ্খার জন্য ঘটে তা নয়। অনেক সময় কিছু রোগের জন্যও তা ঘটে, যার চিকিৎসা করে এই ধরনের আসক্তি দূর করা যায়। যেমন যৌনাঙ্গে চর্মরোগ

বা পেটে গুঁড়োকৃমির সংক্রমণ ঘটলেও যৌনাঙ্গ কৃত্রিমভাবে উত্তেজিত হয়। এই উত্তেজনা প্রশমন করার জন্য হস্তমৈথুনের আশ্রয় নিতে হতে পারে। এই চর্মরোগের বা গুঁড়োকৃমির উপযুক্ত চিকিৎসা করলে এই অস্বাভাবিক উত্তেজনা প্রশমিত হতে পারে। মেয়েদের ক্ষেত্রেও নানা ধরনের যোনিপ্রদাহ (vaginitis) এই ধরনের সমস্যা ডেকে আনে। অন্যদিকে কারো কারোর ক্ষেত্রে ঘুমের মধ্যে বীর্যপাত হওয়ার প্রবণতা থাকে, যাকে স্বপ্নদোষ (nocturnal emission) হিসেবে অভিহিত করা হয়। এই 'স্বপ্নদোষ' দূর করতে ঘুমোতে যাওয়ার আগে হস্তমৈথুনের আশ্রয় নেয় অনেকে। আবার হস্তমৈথুন বন্ধ করলে স্বপ্নদোষের পুনরাবির্ভাব ঘটতে পারে। এইভাবে অস্বাভাবিক বীর্য স্খলনের চক্রে বাঁধা পড়ে যায় অনেকেই। এই ব্যাপারটি দূর করতে জীবনযাত্রা ও চিন্তাভাবনার ধারার পরিবর্তন করা প্রয়োজন। বিভিন্ন ধরনের সুস্থ ও যৌথ সামাজিক কাজকর্ম এবং অবসর বিনোদনের মাধ্যম হিসেবে খেলাধুলা-গান-বই ইত্যাদির মধ্যে নিজেকে নিয়োজিত করা এবং শারীরিক প্রয়োজন অনুযায়ী সপ্তাহে বড়জোর দু' একবার হস্তমৈথুন করা—এসব বিষয়কে নিয়ম করেই অনুসরণ করা যায়।

(৯)

জরায়ু বাদ মানে নারীত্বের অবসান নয়

নারীর জরায়ু আছে বলেই পৃথিবীতে মানবপ্রজাতি টিকে আছে। নারী-পুরুষের যৌন মিলনের পর নারীর ডিম্বনালীতে নারীর ডিম্বকোষ ও পুরুষের শুক্রকোষ নিষিক্ত হওয়ার পর এই জরায়ুতেই তা চলে আসে এবং এইখানেই ২৮০ দিন (১০চান্দ্রমাস) ধরে বিকশিত হয়ে একটি পরিপূর্ণ মানবশিশুর জন্ম হয়। এখন অবশ্যি এই মিলন ছাড়াই পরীক্ষাগারে কৃত্রিমভাবে শিশুর সৃষ্টি করা হচ্ছে। কিন্তু সেক্ষেত্রেও এখনো অব্দি নারীর জরায়ুর প্রয়োজন থেকেই গেছে। তবু ভবিষ্যতে হয়তো একদিন জরায়ুর প্রয়োজনও কমে যাবে। কিন্তু পৃথিবীর সমস্ত শিশুর জরায়ু-বহির্ভূত জন্মের ব্যাপারটা অদূর ভবিষ্যতেও হওয়ার সম্ভাবনা নেই। আর এতদিন ধরে আমাদের সবার জন্মই ঘটেছে আমাদের মায়েদের ঐ জরায়ু থেকেই। পুরুষের থেকে নারীর এখানেই বড় তফাৎ। নারী শরীরে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত এই জরায়ু। বিশেষ বহির্যৌনাঙ্গ যেমন নারীত্বের পরিচয়, তেমনি জরায়ু ও ডিম্বাশয়ের মত অন্তর্যৌনাঙ্গ ও নারীত্বের পরিচায়ক। বিশেষত নারীর জন্মদাত্রী ভূমিকার অবিচ্ছেদ্য অংশ জরায়ু।

কিন্তু পাশাপাশি এটিও সত্য যে সন্তান ধারণ ও লালন করার এই কাজটি ছাড়া নারীর নারীত্ব তথা শারীরিক বৈশিষ্ট্য, মানসিক তথা যৌন আবেগ ও আকাঙ্খা ইত্যাদি নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে জরায়ুর কোন ভূমিকা নেই। এসব নির্ধারণ করে মূলত ডিম্বাশয় (ovary) ও অন্যান্য অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত নানা হরমোন। তাই ডিম্বাশয় অক্ষত রেখে কোন কারণে জরায়ু বাদ দেওয়া হলে, নারীর শারীরিক-মানসিক কোন পরিবর্তনই ঘটার কথা নয়। তবু এ সম্পর্কিত ভুল বিশ্বাসের কারণে অনেক মহিলাই অস্ত্রোপচার করে জরায়ু বাদ দেওয়ার পর ভাবতে শুরু করেন যে, এর ফলে নারী হিসেবে তাঁর যে অনুপম বৈশিষ্ট্য তা বুঝি নষ্ট হয়ে গেল। এর ফলে স্বামী বা পুরুষ সঙ্গীর সঙ্গে যৌন মিলনের ক্ষেত্রে অহেতুক হীনমন্যতার সৃষ্টি হয় এবং দু'জনের যৌন-অতৃপ্তি থেকে শারীরিক, পারিবারিক নানাবিধ জটিলতা ও সমস্যার উদ্ভব ঘটে।

অথচ এই মিথ্যা বিশ্বাস যদি না থাকে তবে জরায়ু বাদ দেওয়ার পর বরং আরো নিশ্চিন্তভাবে যৌনজীবনকে উপভোগ করা যায়। কারণ ডিম্বাশয় অক্ষত রেখে জরায়ু বাদ দেওয়ার ফলে যৌন আকাঙ্খা ও যৌনমিলন সংক্রান্ত কাজগুলি অক্ষুন্ন থাকে। কিন্তু সন্তান গর্ভে চলে আসার সামান্যতম সম্ভাবনাও থাকে না। জরায়ু বাদ দেওয়া প্রকৃতপক্ষে জন্মনিয়ন্ত্রণের সবচেয়ে নিরাপদ ও সবচেয়ে কার্যকরী পদ্ধতি।

তবে নিছক জন্মনিয়ন্ত্রণের জন্য জরায়ু বাদ দেওয়ার ব্যাপারটা সচরাচর করা হয় না।

বিশেষ কিছু কারণে এর প্রয়োজন হতে পারে, যার মধ্যে বড় একটি কারণ হল জরায়ু-মুখ (Cervix)-এর ক্যান্সার। জরায়ু-মুখের ক্যান্সারের অতি প্রাথমিক অবস্থায় জরায়ু সম্পূর্ণ বাদ দিলে ক্যান্সার পুনরাক্রমণের সম্ভাবনা যেমন লুপ্ত হয়, তেমনি ক্যান্সার রোগ অন্য কোথাও ছড়িয়ে যাওয়ার আগে এই অস্ত্রোপচার করা হলে রোগিনী সম্পূর্ণ নিরাপদ থাকেন। ক্যান্সার ছাড়াও জরায়ুর ফাইব্রয়েড ধরনের টিউমার হলেও জরায়ু বাদ দেওয়ার প্রয়োজন হতে পারে। অবশ্য ফাইব্রয়েড হলেই জরায়ু বাদ দিতেই হয় তা নয়। অনেক সময় কোন উপসর্গ ছাড়াই তা থাকতে পারে এবং তখন জরায়ু বাদ না দিলেও চলে। কিন্তু যদি এর থেকে অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ ঘটতে থাকে, কিংবা ফাইব্রয়েডের কারণে তলপেটে ব্যথা হয়, মূত্রাশয়ের উপর চাপ পড়ে তবেই জরায়ু বাদ দেওয়ার প্রয়োজন হয়। এছাড়া জরায়ুতে পলিপ (polyp) হলে, জরায়ুর অভ্যন্তরীণ কলার প্রদাহ (endometriosis) ওষুধ ও প্রাথমিক অস্ত্রোপচারে না কমলে, জরায়ুর স্থানচ্যুতি (prolapse) হলেও জরায়ু বাদ দিতে হয়। এই ধরনের নানা প্রয়োজনেই শরীর থেকে জরায়ু বাদ দেওয়া হয়। এবং তার ফলে মূল রোগটির নিরাময় করা যায়। কিন্তু শরীরে তার অন্যকোন বিরূপ প্রতিক্রিয়া ঘটে না, যেমন ঘটে না পিত্তথলি বা অ্যাপেণ্ডিক্স বাদ দিলেও।

অনেকের ধারণা আছে জরায়ু বাদ দেওয়ার ফলে বিষন্নতার সৃষ্টি হয়, যৌন আগ্রহ কমে যায়, যৌনমিলন ঠিকমত করা যায় না, রজোনিবৃত্তি বা মেনোপজ তাড়াতাড়ি চলে আসে ইত্যাদি। এই সব গুলিই মিথ্যা ধারণা। এ সম্পর্কিত মিথ্যা ধারণাটি মনে বদ্ধমূল হয়ে যাওয়ার কারণেই বিষন্নতা আসতে পারে। আর রজোনিবৃত্তিও জরায়ু বাদ দেওয়ার ফলে ঘটে না। শুধুমাত্র জরায়ু থেকে মাসিক রক্তক্ষরণটি বন্ধ থাকে। কিন্তু ডিম্বাশয় থেকে নিয়মিতভাবে রজোনিবৃত্তির নির্দিষ্ট বয়স পর্যন্ত (৪৫-৫০ বছর) ডিম্বনিঃসরণ (ovulation) যেমন ঘটে, তেমনি অন্যান্য হরমোনও ঠিকমত বেরোয়। এর ফলে স্ত্রী হরমোনের সামগ্রিক প্রভাব অক্ষুন্নই থাকে। ফলে যৌন আকাঙ্খা বা যৌনমিলনের জন্য যোনিদেশের প্রয়োজনীয় সিক্ততা—সবকিছুই ঠিকঠাক থাকে। তাই চিকিৎসাগত কারণে জরায়ু কোনভাব বাদ গেলে মনের মধ্যে কোন হীনমন্যতা না রেখে বা নারী হিসেবে নিজেকে অসম্পূর্ণ না ভেবে সুস্থ স্বাভাবিক জীবন যাপন করলেই নিজের শরীর ও মন, দাম্পত্য জীবন ও পারিবারিক পরিবেশ সুখী হবে।

(১০)
ঋতুমতী তুমি 'অশুচি' নও

"....মাসিকের সময় মহিলাদের রক্তে toxin এবং— Menotoxin তৈরি হয়, যা সকল প্রকার সূক্ষ্ম জীবিতাংশের (Protoplasmic) পক্ষেই ক্ষতিকারক। সেইজন্য মাসিকের সময় স্ত্রীলোকদের সংসারের সবকিছু থেকে দূরে সরিয়ে রাখা প্রয়োজনীয়।"

ট্রেনে-বাসে ফেরিওয়ালারা 'সংস্কারের উপকারিতা' বা 'কুসংস্কারের কি ও কেন' জাতীয় বটতলামার্কা চটিবই বিক্রি করেন। এ ধরনের বইপত্রে নানা উদ্ভট, অবৈজ্ঞানিক, মনগড়া কথাবার্তার মাধ্যমে পুরনো ও প্রচলিত নানা সংস্কার-কুসংস্কারকে যথার্থ প্রমাণ করার হাস্যকর চেষ্টা করা হয়। কিন্তু ওপরের ঐ কথা গুলি এ ধরনের কোন বটতলা মার্কা চটিবইতে লেখা হয়নি। নীহাররঞ্জন রায়ের ভূমিকা সম্বলিত, ডঃ বরুণ কুমার চক্রবর্তীর লেখা, কলকাতার নামকরা এক প্রকাশক কর্তৃক প্রকাশিত 'লোক-বিশ্বাস ও লোক-সংস্কার' নামক বইতে (২য় সংস্করণ) লেখা হয়েছে কথাগুলি।

মাসিক ঋতুস্রাব চলাকালীন মেয়েদের অশুচি, অপবিত্র ভাবা এবং বিয়ে, শ্রাদ্ধ, পূজা, স্বস্ত্যয়ন ইত্যাদির মত তথাকথিত নানা শুভ কাজে অংশগ্রহণ না করতে দেওয়ার কুসংস্কার বেশ প্রচলিত। পৃথিবীর নানা দেশের মানুষ প্রাচীনকালে কিছু মনগড়া ধারণার উপর ভিত্তি করে এমন কুসংস্কারের জন্ম দিয়েছে, আমাদের দেশে তো বটেই। ঋতুমতী কোন মেয়ে পুজো আচ্চার জিনিষপত্র, ফলমূল, ছুঁয়ে ফেল্লেই সর্বনাশ। এখনো অনেক মহিলা নিজেদের সম্পর্কে এমন ধারণা পোষণ করেন, মাসিকের সময় নিজেরাই ঐভাবে ছোঁয়াছুঁয়ির ব্যাপারে সতর্ক থাকেন।

কিন্তু সত্য কথা বলতে কি, মাসিকের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এই ধরনের বিশ্বাসের পেছনে সামান্যতম কোন যুক্তি নেই, ব্যাপারটি নিছকই একটি কুসংস্কার। তাছাড়া এইভাবে শুচি-অশুচি, শুভ-অশুভ, পবিত্র-অপবিত্র ধরনের বিশ্বাসগুলিও মিথ্যা। পরিষ্কার-অপরিচ্ছন্নতার ব্যাপারটা তবু বোঝা যায়, কিন্তু মাসিক ঋতুস্রাব শুরু হওয়া মাত্র নারীর পুরো শরীরটা অপবিত্র বা অশুচি হয়ে গেল, এমনটি ভাবার কোন যুক্তি নেই। মাসিকের সময় ঐভাবে toxin বা Menotoxin জাতীয় কিছু বেরোয়ও না। Toxin মানে কোন ক্ষতিকর পদার্থ। মাসিকের সময় বা তার রক্তের সঙ্গে এই ধরনের কিছু বেরোয় না। আর Menotoxin নামে কোন পদার্থ তো বাস্তবে অস্তিত্বহীন। তাই, এসবের জন্য 'মাসিকের সময় কোন কিছু ছোঁয়া উচিত নয়' এ ধরনের কুসংস্কারের যথার্থ্য প্রতিষ্ঠা করার অপচেষ্টা একেবারেই হাস্যকর। আর এই ধরনের শিক্ষিত ও পন্ডিত ব্যক্তিদের মাথায় এটুকুও আসে না যে,

যদি সত্যিই তা 'সকল প্রকার সূক্ষ্ম জীবিতাংশের পক্ষেই ক্ষতিকর' হত, তবে তো যার শরীর থেকে বেরুচ্ছে সেই নারীর (যে অবশ্যই জীবিত) পুরো শরীরটাই 'ক্ষতিগ্রস্ত' হত বা সে মারা পড়ত। এত হাজার বছর ধরে,এত কোটি নারীর এত অসংখ্যবার মাসিক রক্তস্রাব হয়েছে,—কিন্তু মাসিক হওয়ার কারণে তাঁদের শরীর ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এমন কিছু জানা নেই। (তবে প্রতি মাসিকের সময় যে রক্ত শরীর থেকে বেরিয়ে যায়, তা পূরণ করতে মেয়েদের উপযুক্ত খাদ্য গ্রহণ করা দরকার, বিশেষ করে লৌহ ঘটিত লবণযুক্ত খাদ্য, যেমন রুটি, উচ্ছে, ডুমুর, থোড়, মোচা, কাঁচকলা ইত্যাদি সাধারণ পাঁচমিশালী খাবার দাবার, শাকসব্জি, ফলমূল। ছেলেদের থেকে মেয়েদের এই ধরনের খাবারের চাহিদা তুলনামূলকভাবে বেশি। ঋতুমতী নারী অপুষ্টির শিকার হলেই একমাত্র তাঁর শরীর ক্ষতিগ্রস্ত হয়, মেনোটক্সিন-এর জন্য নয়।)

মাসিক ঋতুস্রাবের সময় নারীকে অশুচি-অপবিত্র ভাবার সঙ্গে যথাসম্ভব যৌনতা ও যৌনাঙ্গ সম্পর্কিত কিছু দৃষ্টিভঙ্গীও কাজ করে। যেহেতু নারীর বহির্যৌনাঙ্গ থেকে রক্ত বেরুচ্ছে, তাই ভাবা হয় তা বুঝি নোংরা। কিন্তু হাতপায়ের কোথাও কেটে গেলে যে রক্ত বেরোয় মাসিকের সময়কার রক্তের সঙ্গে তার কোন পার্থক্য নেই। শরীরের কোথাও কেটে গেলে সংশ্লিষ্ট ধমনী (artery) ও শিরা (vein) কেটে তার রক্ত বেরোয়। মাসিকের সময় বেরোয় জরায়ুর ভেতরের সূক্ষ্ম রক্তবহানালী ছিঁড়ে গিয়ে,—ঐ রক্তের শতকরা ৭৫ ভাগই আসে ধমনী থেকে, বাকি ২৫ ভাগ শিরা থেকে।*

আর যৌনাঙ্গ সম্পর্কে লজ্জা, শালীনতা ইত্যাদি থাকলেও, সেটিও শরীরের অন্যান্য অঙ্গের মত প্রয়োজনীয় ও স্বাভাবিক একটি অঙ্গ। শরীরের অন্যান্য অঙ্গের মত সেটিও নিয়মিত পরিষ্কার করা উচিত এবং অপরিচ্ছন্ন থাকলে অন্যান্য অংশের মত সেটিও ব্যাধিগ্রস্ত হতে পারে। সব মিলিয়ে কোনভাবেই মাসিক ঋতুস্রাব অপবিত্র বা অশুচি ধরনের একটি ঘটনা— এমনটি ভাবার কোন কারণ নেই।

তবু ঐ সময় ছোঁয়াছুঁয়ি সম্পর্কিত বিধিনিষেধের যাথার্থ্য প্রতিষ্ঠা করার জন্য নানা যুক্তিও হাজির করা হয়। যেমন পূর্বোক্ত বইতেই আরো লেখা হয়েছে, "মাসিকের সময় মহিলাদের ঐ ক'দিন বাড়ীর কোন কাজ কর্ম করতে নেই। আগেকার দিনে যখন আমাদের সমাজে একান্নবর্তী পরিবার প্রথা ছিল, তখন মহিলাদের মাসে দু'তিন দিন বিশ্রাম দেওয়ার একটা প্রথা ছিল। সারাদিন উদয়াস্ত পরিশ্রম করতে হত যাদের, তাদের পক্ষে মাসে দু'তিনদিন

* এই রক্ত কোনভাবে মুখে গেলেও তা আদৌই ক্ষতিকর নয়, যেমন কোথাও কেটে গেলে ঐ রক্ত অনেক সময়ই চুষে খেয়ে ফেলা হয়। সত্যিকথা বলতে কি কোন কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে (যেমন নাকি বাউলদের কোন কোন গোষ্ঠীর মধ্যে) সঙ্গিনীর ঋতুস্রাবের রক্ত খাওয়ার প্রথা আছে। এই সময় যৌনমিলনও ক্ষতিকর নয় (অবশ্যই যদি তা অরুচিকর বা অস্বস্তিকর না হয়)। ঋতুস্রাবের সময় যৌনমিলন করা হলে তার ফলে সন্তানধারণের সম্ভাবনাও থাকে না। তবে তার ফলে পুরুষের লিঙ্গমুণ্ডে রক্ত লেগে প্রদাহ (balanitis) ঘটতে পারে। তাই সঙ্গে সঙ্গেই তা ধুয়ে ফেলা দরকার।

বিশ্রাম গ্রহণ করা ছিল খুবই প্রয়োজনীয়। সংসারের সুবিধার জন্য এই বিশ্রাম গ্রহণের সময়টা নির্বাচন করা হয় মাসিকের সময়ে। মাসিকের ফলে স্ত্রীলোকেরা এমনিতেই এই সময় স্বাভাবিক অবস্থার তুলনায় দুর্বল হয়ে পড়ে। তাই এমনিতেও তাদের বিশ্রামের প্রয়োজন হয়।" আসলে যেভাবে হোক প্রচলিত কুসংস্কারের মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠা করা! 'আগেকার দিনে' ঐ ভাবে মহিলাদের মাসে দু'তিনদিন বিশ্রাম দেওয়ার প্রথা সত্যিই ছিল কিনা সন্দেহ আছে। থাকলে তা ভালই হত। মাসিকের সময় অস্বস্তির কারণে স্বাধীনভাবে সব কিছু করার ক্ষেত্রেও কিছু অসুবিধা হয়। কিন্তু তাই বলে অপুষ্টিতে না ভোগা, সুস্থ সবল মহিলারা মাসিকের সময় খুব দুর্বল হয়ে পড়েন বা একেবারে কাহিল হয়ে যান তা কিন্তু নয়। যাঁদের অপুষ্টি বা শারীরিক দুর্বলতা আগে থেকেই ছিল, তাঁদের কথা আলাদা, অন্যথায় মাসিকের সময় খুব ভারি শারীরিক পরিশ্রমের কাজ ছাড়া অন্যান্য দৈনন্দিন কাজকর্ম অনায়াসেই করা যায়। এবং প্রায় সব মহিলারা তা করেনও, এখনকার কর্মরতা মহিলারা তো বটেই।

মাসিক ঋতুস্রাবের ঐ কয়েকদিনে কয়েক ফোঁটা থেকে শুরু করে গড়ে প্রায় ৩০ মিলিলিটার (প্রায় এক আউন্স) রক্ত বেরোয়। রক্তাল্পতা (অ্যানিমিয়া) ও অপুষ্টিতে না ভোগা কোন মহিলার শরীর থেকে ৪-৫ দিনে এই টুকু পরিমাণ রক্ত বেরোলে তা শরীরকে এমন কিছু দুর্বল বা কাহিল করে দেয় না। তা যদি দিত, তবে তো স্বেচ্ছা রক্ত দান শিবিরে এককালীন এর ৭-৮ গুণ (২৫০ মিলিলিটার) রক্তদান করার পর রক্তদাতারা হয়তো মারাই যেতেন। স্বাভাবিকভাবে অল্প কয়েক দিনে এই টুকু ঘাটতি শরীর ঠিকও করে দেয়।

বয়ঃসন্ধি থেকে রজোনিবৃত্তি পর্যন্ত নারীর প্রজনন বয়সে, প্রতিমাসে (আসলে গড়ে ২৮ দিনে) নারীকে সন্তানের জন্ম দেওয়ার জন্য প্রস্তুত করার (তথা গর্ভবতী করার) যে শারীরিক প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া সেটিই মাসিক ঋতুচক্র (menstrual cycle)। এই চক্রের প্রায় শুরু থেকেই হরমোনের প্রভাবে জরায়ু (uterus) সন্তান ধারণের জন্য প্রস্তুত হতে থাকে, তার অভ্যন্তরীণ আবরণীর বিশেষ পরিবর্তন ঘটতে থাকে। আর এই চক্রের মাঝামাঝি সময়ে (মোটামুটি ১৪ দিনের আশেপাশে) নারীর দু'টি ডিম্বাশয়ের কোন একটির একটি মাত্র গ্রাফিয়ান ফলিকল (Graafian follicle) পূর্ণ বিকশিত হয়ে একটি মাত্র ডিম্বকোষ (ovum)-এর নিঃসরণ ঘটায়। এই সময় যৌনমিলন ঘটলে পুরুষের বীর্যের কয়েক কোটি শুক্রকোষ (spermatozoa)-র মাত্র একটি ঐ একমেবাদ্বিতীয়ম ডিম্বকোষের সঙ্গে মিলিত হয় ও সন্তানের ভ্রূণাবস্থার সৃষ্টি করে। আর সাধারণত তারপর থেকে সন্তান প্রসবের পরবর্তী কয়েক মাস অব্দি ঋতুস্রাব বন্ধ থাকে। কিন্তু যদি যৌনমিলন না ঘটে তথা শুক্রকোষ না আসে তবে ঐ ডিম্বকোষটি মারা যায় এবং কয়েকদিন পর জরায়ুর অভ্যন্তরীণ আবরণীর রক্তবহা নালিকা ছিঁড়ে গিয়ে রক্তপাত ঘটে, যা যোনিপথ (vagina) দিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসে এবং এটিই মাসিক ঋতুস্রাব (menstruaiton)। তাই এই রক্তক্ষরণকে শুক্রকোষের

জন্য তথা সন্তানের বিরহে জরায়ুর 'কান্না' হিসেবে বলা হয়। আর এই পুরো ব্যাপারটির মধ্যে 'অশুভ' বা 'অশুচিকর' 'নোংরা' কোন ব্যাপার নেই, তা নারী শরীরকে 'অপবিত্র' করে দিতেও পারে না।

(এই আলোচনায় ডঃ বরুণ কুমার চক্রবর্তীর বইটির উল্লেখ নিছক আলোচনার জন্যই করা হয়েছে। অবশ্যই পন্ডিত এই ব্যক্তি আমাদের শ্রদ্ধেয়। কিন্তু তাঁদের মত লোকেরাও কিভাবে ঐতিহ্যপন্থী হয়ে প্রচলিত কুসংস্কারকে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেন, তার জন্য নিছক অন্যতম উদাহরণ হিসেবে তাঁর বইটির উল্লেখ করা হয়েছে।)

(১১)

গর্ভাবস্থা না পেটে কৃমি

মেয়েটির বয়স বছর চৌদ্দ। অত্যন্ত গরীব। লেখাপড়ার সুযোগও বিশেষ পায় নি। বাড়িতে স্থানাভাব থাকায় রাত্তিরে শুতে যেত কাছেই দুর সম্পর্কের এক মেসোর বাড়িতে। স্ত্রী-মেয়ে নিয়ে মেসোর সংসার। ঐ মেসো-ই নাকি মেয়েটির সঙ্গে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করে। ভয় দেখায় কাউকে না বলার। আশ্রয় হারানোর ভয়েই হোক, এর পরিণতি সম্পর্কে অজ্ঞতার জন্যই হোক কিংবা যৌন উত্তেজনা বা নিজেরও একটু ভাল লাগার জন্যই হোক,— মেয়েটি কাউকে কিছু বলতে পারে নি। এক সময় মেয়েটি গর্ভবতী হয়ে পড়ে। কিন্তু ঐ টুকু মেয়ে নিজেও এ ব্যাপারে বিশেষ কিছু বুঝতে পারে নি। মেসোকে বলেছিল পেটটা ক্রমশ বড় হওয়ার কথা। মেসো তাকে বুঝিয়েছিল তার পেটে কৃমি হয়েছে। তাই পেটটা বড় বড় লাগছে। সরল বিশ্বাসে মেয়েটি সেটিই বিশ্বাস করেছিল। এক সময় বাড়িতেই প্রসব বেদনা ওঠে। জন্ম নেয় ফুটফুটে একটি মেয়ে। বাড়ির কারোর কাছেই ব্যাপারটা প্রত্যাশিত ছিল না। নাবালিকা মা-টিও বোধহয় আশা করে নি।

ঘটনাটি খোদ কলকাতার বুকে তারাতলা এলাকায়, ২০০৫-এর নভেম্বর মাসেই ঘটেছে। ঘটনার বিবরণ থেকে বোঝা যায় যে কিশোরী ঐ মেয়েটি গর্ভ, গর্ভাবস্থা, যৌনমিলনের পরিণাম—এ সব ব্যাপারে একেবারেই অজ্ঞ ছিল। যে কারণেই যথাসম্ভব মাসিক ঋতুস্রাব বন্ধ হওয়ার গুরুত্ব এবং তার শরীরে যে একটি শিশু ধীরে ধীরে বড় হচ্ছে—এই ব্যাপারটিই তার মাথায় আসে নি। 'মেসো'-র বোঝানো পেটে কৃমির তত্ত্বটিকেই সে সরল মনে বিশ্বাস করেছিল। সাধারণতঃ তা হয় না। মেয়েরা প্রায়শই মায়ের কাছ থেকে মাসিক ঐ রক্তস্রাব যে নিয়মিত একটি ব্যাপার তা বুঝে যায়। তা কোন মাসে বন্ধ হলে সেটি যে স্বাভাবিক ব্যাপার নয়, এই বোধটিও তাদের চলে আসে। কিন্তু অধিকাংশ মেয়েই ঐ বয়সে যৌনমিলনের ব্যাপার স্যাপার আর তার পরিণতিতে গর্ভবতী হয়ে পড়ার সম্ভাবনা সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা অর্জন করে না। কিভাবে যৌনমিলন ঘটে, ১৮-২০ বছর বয়সের আগে এই ধরনের যৌনমিলন তথা গর্ভবতী হওয়া যে উচিত নয়, গর্ভবতী হয়ে পড়া যে সারা জীবনের জন্য একটি স্থায়ি পরিবর্তনের দিক নির্দেশ করে— এগুলি জানার সুযোগ অনেকেরই হয় না। আর এর ফলে কৈশোরের আবেগে এবং সুযোগ সন্ধানী পুরুষের লালসার বলি হয়ে নিজের বিপদ ডেকে আনে।

বিভিন্ন সমীক্ষায় দেখা গেছে, আইনানুগ যৌনসঙ্গী পাওয়ার আগে অর্থাৎ বিয়ের আগে (তথা নিজের ভাললাগা-ভালবাসার পুরুষের সঙ্গে জীবনের স্থায়ি সম্পর্ক তৈরি করার

পাশাপাশি যৌন সম্পর্ক স্থাপন করার পূর্বে),—শতকরা ৯০ ভাগেরও বেশি মেয়ে নানাভাবে যৌন নিগ্রহের শিকার হয়। কিশোরী বা উদ্ভিন্ন যৌবনা, সদ্য যুবতী মেয়েরা তো বটেই, কয়েক মাসের শিশুকন্যা থেকে শুরু করে প্রৌঢ়া বা বৃদ্ধারাও যৌন নিগ্রহের শিকার হয়েছে, এমন উদাহরণও আছে। অপরিচিত, স্বল্প পরিচিত, সুযোগ সন্ধানী পুরুষেরা তো বটেই, এমনকি নিজেরই মামা-কাকা-দাদা-পিসে-মেসোর দ্বারা এমনভাবে নিগ্রহের ঘটনা প্রায়শই ঘটে এবং যথাসম্ভব তার সংখ্যাই তুলনামূলক ভাবে বেশি, কারণ এইভাবে আত্মীয়ের দ্বারা নিগৃহিত হওয়ার ব্যাপারটা প্রায়শঃই প্রকাশ্যে আসে না। সারা জীবন একটি মেয়ে মনের গোপনে ঐ ঘটনার কথা পুষে রাখে। শিক্ষকের হাতে ৭-৮ বছরের ছাত্রীর এবং বিরল ক্ষেত্রে নিজের পিতার দ্বারা (হয়তো বা মদের ঘোরে কিংবা নিছক যৌন বিকৃতির কারণে) কন্যার ধর্ষিতা হওয়ার ঘটনাও ঘটে। সব মিলিয়ে কোন বয়সের মেয়েই কোন পুরুষের কাছে অনাকাঙ্খিত যৌনতার ব্যাপারে নিরাপদ নয়।

এর অর্থ আবার এও নয় যে, সব পুরুষই সব মেয়ের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার মত মানসিকতার অধিকারী। কিন্তু পাশাপাশি এটিও সত্যি যে, এ ব্যাপারে ছেলে-মেয়ে দু'জনেরই, বিশেষত মেয়েদের সচেতনতা অনেক বেশি প্রয়োজন। নেহাতই শিশু কন্যা বা নাবালিকার পক্ষ থেকে এই ধরনের সচেতনতা ও প্রতিরোধ আশা করা যায় না। কিন্তু অন্তত মাসিক ঋতুচক্র হওয়ার বয়সের বেশ কিছুদিন আগে থেকেই মেয়েদের নিজের শরীর ও যৌনতা সম্পর্কে সচেতনতা গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া দরকার। হঠাৎ একদিন রক্তস্রাব শুরু হলে ভয় পেয়ে মাকে জানানোর আগে এ ব্যাপারে আগে থেকে তার মানসিক প্রস্তুতি থাকাটাই কাম্য। আর যে মেয়ের মা বা অন্তত নিকটাত্মীয় কোন মহিলা নেই, ঐ ধরনের মাতৃহীনা মেয়ের কাছে তো ব্যাপারটি আরো অসহায়তার জন্ম দেয়। বিদ্যালয়েই তাই এ ব্যাপারটি শুরু করা দরকার।

পাশাপাশি দরকার ছেলেদেরও এ ব্যাপারে সচেতন করার। বয়ঃসন্ধির সময় একটি মেয়ের শরীর সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞতা ও স্বাভাবিক আগ্রহ বা কৌতূহল বিকৃতির জন্ম দিতে পারে। যৌনমিলন যে একটি বয়সে স্বাভাবিক ও প্রয়োজনীয় একটি জৈবিক প্রক্রিয়া এই বোধটি তাদের মধ্যে সৃষ্টি হওয়া দরকার। এই উপযুক্ত বয়স হওয়ার আগে যৌনমিলনের জন্য আগ্রহী হওয়ার মধ্যে যে অস্বাভাবিকত্ব রয়েছে তাও বোঝানো দরকার। একসময় ছিল যখন অনেক কম বয়সেই ছেলেদের বিয়ে হয়ে যেত। কিন্তু এখন ২১ বছরের নীচে বিয়ে করা বেআইনী। তার আগের বয়সটা, এমনকি পরবর্তী আরো কয়েক বছরও, ভবিষ্যৎ জীবনের প্রস্তুতির জন্যই ব্যয় করা উচিত। পাশাপাশি যৌনতা ছাড়াও নিজের জন্য, পরিবারের জন্য, দেশ ও সমাজের সব মানুষের জন্য যে অনেক কাজ করার আছে,—এই অনুভবও তাদের মধ্যে সৃষ্টি করা উচিত। বিচ্ছিন্নভাবে যৌনশিক্ষা (প্রজনন বিজ্ঞান প্রশিক্ষণ বা জীবনশৈলী শিক্ষা) যৌন আগ্রহকে আরো শক্তিশালী করে দিতে পারে।

বিদ্যালয় স্তরেই ছাত্রছাত্রীরা উদ্ভিদের পরাগমিলন বা প্রাণীদের প্রজনন সম্পর্কে লেখা পড়া করে। অথচ মানুষের অর্থাৎ নিজ প্রজাতির প্রজনন প্রক্রিয়া সম্পর্কে অজ্ঞ থাকে। এই ধরনের অজ্ঞতা কাম্য নয়। অবশ্য যে দেশের বেশিরভাগ কিশোর-কিশোরীই বিদ্যালয় শিক্ষা, এমনকি প্রাথমিক শিক্ষাটুকুও পায় না, সে দেশে অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে প্রজনন বিজ্ঞান শিক্ষা বা তথাকথিত ঐ যৌনশিক্ষার ব্যাপারটিও সার্থকভাবে করা হবে, সে আশা সুদূর পরাহত।

একই সঙ্গে ঐ যৌনশিক্ষার সার্থকতা আর্থসামাজিক অবস্থা ও সার্বিক সুস্থ সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলের উপরও নির্ভর করে। কৈশোর পেরিয়ে যৌবনে উপনীত হলে যদি সবার আর্থিক স্বাচ্ছল্য ও স্বাচ্ছন্দ্য থাকত, বিয়ে করে নিজের পরিবার শুরু করার বা নিশ্চিন্তে যৌন জীবন শুরু করার মত অবস্থায় থাকত বা তার নিশ্চয়তা থাকত—তবেও বিকৃত যৌন আচরণের প্রবণতা, পুরুষের হাতে মেয়েদের যৌন নিগ্রহ কমত বা মেয়েদের মধ্যে নিজের যৌন আগ্রহ তথা সন্তানলাভের জন্য স্বাভাবিক আগ্রহকে দ্রুত মেটানোর চেষ্টা কমত। কিন্তু শুধু আর্থিক-সামাজিক নিশ্চয়তাই নয়। পাশাপাশি প্রয়োজন সুস্থ জীবনবোধও।

অবশ্য এই সুস্থ জীবনবোধ-এর মত কথাবার্তাগুলির সঠিক ও সুনির্দিষ্ট ব্যাখ্যা দেওয়া মুস্কিল। তবু যৌনতা ও হিংসার মত 'আদিম' প্রবৃত্তিগুলিকে সুশৃঙ্খল করার পাশাপাশি নিছক আত্মকেন্দ্রিকতা থেকে মুক্ত হওয়া, সমষ্টির জন্য ও সমষ্টির অংশ হিসেবে নিজের জীবনযাপন করা—এগুলি এই ধরনের মূল্যবোধের বড় দিক। আদিম পৃথিবীতে বেঁচে থাকার লড়াইতে একদিকে প্রজনন তথা নিজেদের সংখ্যাবৃদ্ধি ও যৌনতা, অন্যদিকে হিংসা ছিল মানুষের অস্তিত্বের সমার্থক। যৌনক্ষমতাহীন মানুষ এবং ঐ আদিম পৃথিবীতে অহিংস মানুষ—দুটিই ছিল মানুষের অস্তিত্ব বিলুপ্তির সমান। কিন্তু এখন আর ঐ পরিবেশ নেই। নিছক সংখ্যাবৃদ্ধির জন্য যৌনতা এখন অপ্রাসঙ্গিক ও গুরুত্বহীন। একইভাবে পরস্পরের প্রতি হিংসা তো বটেই, তথাকথিত হিংস্র পশুদের প্রতিও হিংসা ছাড়াই মানুষ এখন তার অস্তিত্ব এই পৃথিবীতে ভালভাবেই টিকিয়ে রাখতে পারে।

যৌনক্রিয়া মূলত ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে আনন্দদায়ক; বড়জোর সঙ্গী বা সঙ্গিনীর প্রবল আগ্রহ মেটাতে তার সম্মতিক্রমে তা সংঘটিত হলে, সেটি-ই আরেকজনের পক্ষে আনন্দদায়ক। তাই নিজ প্রজাতির সংখ্যাবৃদ্ধি করার সামাজিক দিকটি বাদ দিলে এটি মূলত একটি আত্মকেন্দ্রিক প্রক্রিয়া, যেটিরও ব্যক্তিবিশেষের কাছে শারীরিক ও মানসিক উভয়দিক থেকে প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। প্রধানত এ কারণে যৌনতা তথা যৌনক্রিয়ার ব্যাপারগুলিকে সামাজিক ভাবে এখন আর উৎসাহিত করার প্রয়োজন হয় না। এক সময় 'শতপুত্রের জননী হও' জাতীয় আশীর্বাদের যে সামাজিক উপযোগিতা ছিল, এখন আর তা নেই। তাই ঋতুমতী হওয়া মাত্রই নারীকে সন্তান ধারণের জন্য উৎসাহিত করার মত সামাজিক বা তথাকথিত নানা ধর্মীয় নির্দেশ এখন অপ্রয়োজনীয়। 'ঋতু নিস্ফল করা অন্যায়' জাতীয় কথাবার্তা (যেমন যমের প্রতি যমীর উক্তি) রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণের মত নানা প্রাচীন

ধর্ম সাহিত্যে আকছার দেখা গেলেও, এখনো ঐ সব কথাবার্তাকে আঁকড়ে রাখা নির্বুদ্ধি তার লক্ষণ। তা আর করা হয়ও না।

এই অবস্থায় যৌনতার মধ্যেও শৃঙ্খলা ও নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। এই নিয়ন্ত্রণ শুধু সামাজিক কারণে নয়, বিশেষত নারীর শারীরিক ও সামাজিক সুরক্ষার জন্যও প্রয়োজন। কিশোরী বয়সে একটি মেয়ে যদি যৌনক্রিয়ায় অভ্যস্ত হয়ে ওঠে তবে উপযুক্ত সুরক্ষা না থাকলে গর্ভবতী হয়ে পড়তে পারে। বিয়ে যদি হয় তবে সামাজিক স্বীকৃতির ব্যাপারটি তবু মেটে। কিন্তু যদি তা না হয়, তবে হয় গর্ভপাত করাতে হয়, নতুবা সামাজিক অবমাননার শিকার হতে হয়—অন্তত আমাদের দেশের পরিবেশে। কম বয়সে বারবার গর্ভপাত মেয়েটির স্থায়ি শারীরিক বৈকল্যেরও সৃষ্টি করতে পারে। অন্যদিকে কম বয়সের একটি মেয়ে আত্মনির্ভর হওয়ার আগে সন্তান নিয়ে বিপদে পড়ে, যা সন্তানের পক্ষেও ক্ষতিকর। তবু পূর্ণ বয়সে, স্বাবলম্বী কোন মেয়ে তার পছন্দের পুরুষের দ্বারা সন্তান পেতে পারে। তাকে সে নিজের পরিচয়ে বড়ও করতে পারে, একক মাতৃত্বের দ্বারা (single mother)। ব্যাপারটি আমাদের দেশের সমাজে এখনো ততটা গ্রহণীয় নয়। কিন্তু সেটি সমাজেরই দোষ তথা তার বেশিরভাগ মানুষের সংকীর্ণ মানসিকতার পরিচয়,—ঐ মায়ের নয়।

আবার যৌনমিলনের ফলে গর্ভবতী হওয়ার সম্ভাবনা এবং এই গর্ভ এড়াতে গর্ভনিরোধকের ব্যবহার (যেমন কণ্ডোম, নিরাপদ সময়, কপার-টি, বীর্যপাতের মুহূর্তে সরে আসা, গর্ভনিরোধক পিল তথা ওষুধপত্র ইত্যাদি ইত্যাদি) সম্পর্কে সচেতনতা এগুলিও প্রাক্‌যৌবনে অর্জন করা দরকার। কম বয়সে গর্ভবতী হওয়ার সম্ভাবনা এড়াতে প্রজনন বিজ্ঞান প্রশিক্ষণ তথা যৌনশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। এটি যৌনক্রিয়ার অবাঞ্ছিত প্রতিক্রিয়া থেকে রক্ষা করার ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে।

(১২)

সন্তানহীনতার চিকিৎসা মাটি, মাদুলি বা মানৎ করা নয়

নারী-পুরুষের যৌনমিলনে সন্তানের জন্ম হওয়া একটি স্বাভাবিক প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া। আমরা সবাই আমাদের ইচ্ছা ব্যাতিরেকেই আমাদের বাবা-মায়ের ইচ্ছায় ও যৌনমিলনের ফলেই জন্মেছি। প্রকৃতপক্ষে বংশবৃদ্ধির প্রাকৃতিক এই প্রক্রিয়াটি সমস্ত জীবিত প্রাণী ও উদ্ভিদের প্রাথমিক বৈশিষ্ট্য। প্রকৃতির বিবর্তনে নিছক এই মানুষ সহ নানা প্রাণী ও উদ্ভিদের সৃষ্টি হয়নি, সঙ্গে তাদের প্রজনন ক্ষমতার তথা বংশবৃদ্ধির ও উত্তরসূরী রেখে যাওয়ার ব্যাপারটিও ঘটেছে।

আর তাই সাধারণভাবে প্রতিটি প্রাণী ও উদ্ভিদের মানসিক প্রবণতাই হচ্ছে বংশবৃদ্ধি ঘটানো। মানুষও তার ব্যতিক্রম নয়। কিন্তু মানুষ ব্যতিক্রম এই হিসেবে যে, অন্যান্য কোন প্রাণী বা উদ্ভিদের যদি বংশবৃদ্ধি না ঘটে তবে তার জন্য তারা মানুষের মত, বিশেষত স্ত্রীর উপর সব দোষ চাপায় না বা সন্তানলাভের জন্য মানুষের অসংখ্য সংস্কারাচ্ছন্ন আচার-আচরণ-অনুষ্ঠানাদি থেকে শুরু করে আধুনিক কালের বিজ্ঞান সম্মত কোন উপায়ও অবলম্বন করে না। তারা নিছক বারংবার পরাগ মিলন বা যৌন ক্রিয়াই করে চলে।

কিন্তু মানুষের মধ্যে প্রচলিত বিশ্বাসই হচ্ছে সন্তানহীনতার জন্য নারীই দায়ি, যেহেতু সরাসরি নারীর শরীর থেকে সন্তানের জন্ম হয়। নারী শারীরিক ভাবে সন্তানের জন্মদানে সক্ষম থাকলেও, তার যৌনসঙ্গী পুরুষের শারীরিক ত্রুটির কারণেও যে সন্তানের জন্ম না হতে পারে,—এই বোধটি এখনো বহু মানুষের মধ্যে নেই। এক সময় এই ধারণা ছিল প্রায় সর্বজনীন। কিন্তু বর্তমানে বিশেষত শিক্ষিত মানুষজনের অনেকেই এই ধরনের একপেশে ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন বিশ্বাস থেকে মুক্ত হয়েছেন। তবু সন্তানহীনতার জন্য (বারবার কন্যা সন্তানের জন্ম দেওয়ার জন্যও) শুধু নারীরই উপর অপবাদ চাপানোর মত লোকজন এখনো সংখ্যাগুরু। আর এই কারণে সন্তানহীনা নারীকে বাঁজা, আঁটকুড়ে, বন্ধ্যা হিসেবে গালাগাল করা হয় এবং তাকে তথা তার উপস্থিতিকে অশুভ, অমঙ্গলজনক হিসেবে মনে করা হয়। কোন পুজো বা বিয়ের অনুষ্ঠানে এখনো বহু স্থানে বন্ধ্যা নারী ব্রাত্য। বন্ধ্যা নারীর মুখ দেখাও অমঙ্গলজনক হিসেবে ভাবা হয়। যাত্রার শুরুতে বা সকাল বেলায় তাই এমন রমণীর (বিধবা রমণীরও) দর্শন যাতে না ঘটে তার চেষ্টা করা হয়। অথচ দম্পতির বন্ধ্যাত্ব যে পুরুষের জন্যও হতে পারে এটি মাথাতেই থাকে না এবং পুরুষকে ঐ ভাবে বাঁজা, আঁটকুড়ে, অশুভ ইত্যাদি ভাবা আদৌ হয় না। ব্যাপারটি একসময় অজ্ঞতার

কারণেই মূলত ঘটলেও, সঙ্গে পুরুষতান্ত্রিক সমাজের মানসিকতা ও পরিমন্ডলও এক্ষেত্রে একটি বড় ভূমিকা পালন করেছে।

আর অজ্ঞতার জন্য বন্ধ্যাত্বের নিরসন ঘটিয়ে সন্তানলাভের জন্য নানাবিধ সংস্কারাচ্ছন্ন কাজকর্মও করা হয়। যেমন কোথাও ভাবা হয় একটি বট ও পাকুড়ের চারাকে পাশাপাশি পুঁতে তাদের যদি বিয়ে দেওয়া হয় এবং স্বামী-স্ত্রী যদি জল দিয়ে তাদের বাঁচিয়ে রাখতে পারে তবে তাঁদের সন্তান হবে। এছাড়া আছে মানত করা। ঠাকুরের থানে হত্যা দিয়ে পড়া, মানত করে মন্দিরে বা কল্পিত নানা ঠাকুরের থানে দড়িতে ঢিল বেঁধে ঝোলানো, সন্তান হলে কোন জিনিষ উৎসর্গ করার প্রতিশ্রুতি দেওয়া ইত্যাদি অসংখ্য উপায় অবলম্বন করা হয়। এরই চরম বীভৎস রূপ হলো, সন্তানলাভের জন্য দেবতা বা কোন দেবীর কাছে অন্য একটি শিশুকে বলি দেওয়া। এক সময় তো এই প্রথা যথেষ্টই ছিল। বর্তমানে বিরল হলেও, এখনো এই ভারতবর্ষে এমন ঘটনা মাঝে মাঝেই ঘটে। সংবাদ পত্রের এক কোণে কখনো কখনো দেখা যায়, অমুক গ্রামে অমুক তান্ত্রিক বা বাবাজি গুরুজির পরামর্শে বন্ধ্যা রমণী শিশুবলি দিয়েছে। আর নানা ধরনের জড়িবুটি, মাদুলি, পূজা আচ্চা এসব তো আছেই। পৃথিবীর সব জনগোষ্ঠীর মধ্যেই এই ধরনের নানা প্রক্রিয়া কম বেশি ছিল এবং এখনো আছে। কখনো কখেনো বিশেষ কোন পুকুরের জল বা মাটি সম্পর্কে প্রচার করা হয় যে, ঐগুলো খেলে বা গায়ে মাখলে বাচ্চা হবে। পড়ে যায় সন্তানহীনা নারীদের স্রোত আর থালা উপচানো প্রণামী। হিন্দুদের মধ্যে আবার বিশ্বাস আছে মা ষষ্ঠীর কৃপাতে সন্তান হয়। সন্তানের আশায় চলে ষষ্ঠী পুজো। কোথাও বিশ্বাস আছে রবিবার আঁটকুড়োবার; ঐ দিন নতুন কাপড় পরলে বাচ্চা হবে না।

কিন্তু এখন এ ব্যাপারে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই যে, ষষ্ঠী বা কার্তিক নামক অস্তিত্বহীন দেব-দেবীর করুণায় যেমন বাচ্চা হয় না, তেমনি নিছক পূজা-প্রার্থনা-মানত করা-বলি দেওয়া কিংবা কোন বিশেষ জল বা মাটি খেয়েও বাচ্চা হওয়ার সামান্যতম সম্ভাবনা নেই। অন্যদিকে সন্তানহীনতার পেছনে স্বামী বা পুরুষের ভূমিকাও সমান গুরুত্বপূর্ণ।

স্ত্রীর কোন গন্ডগোল নেই, শুধু পুরুষের ত্রুটির জন্য সন্তানহীনতার প্রধান কারণগুলি এই রকম—

(১) লিঙ্গ দৌর্বল্য (erectile impotence)—উপযুক্ত ভাবে দৃঢ় লিঙ্গ দিয়ে যৌনমিলনের সময় যোনির ভেতরে বীর্যপাত না ঘটাতে পারলে শুক্রকোষ জরায়ুর ভেতরেই প্রবেশ করতে পারে না।

(২) বীর্যে শুক্রকোষ-এর সংখ্যা কম (oligospermia) বা একেবারে না থাকা (azoospermia)—পুরুষের বীর্যে সুস্থ শুক্রকোষের সংখ্যা যদি প্রতি মিলি লিটারে ২-৪ কোটি হয় তবে ঐ সব পুরুষদের প্রায় অর্ধেক এবং যখন এই সংখ্যা ২ কোটির কম তাদের সবাইই বন্ধ্যা হয়; একটি মাত্র ডিম্বকোষের সঙ্গে মিলনের জন্য এত বিপুল সংখ্যক শুক্রকোষের উপস্থিতি প্রয়োজন হয়। আর বীর্যে যদি শুক্রকোষ আদৌ না থাকে

তাহলে তো নারীকে গর্ভবতী করার প্রশ্নই আসে না। শতকরা প্রায় ৩০ ভাগ সন্তানহীনতার ক্ষেত্রেই প্রধান কারণ থাকে এই শুক্রকোষের সংখ্যাল্পতা।

আর শতকরা ৩-৪ ভাগ ক্ষেত্রে সন্তান না হওয়ার পেছনে ভূমিকা পালন করে অসফল বা অত্যন্ত কম সংখ্যার যৌনমিলন। পুরুষের লিঙ্গ দৌর্বল্যের কারণে যেমন সফল যৌনমিলন সম্ভব নয়, তেমনি সংশ্লিষ্ট নারীর মিলন জনিত কষ্ট (dyspareunia) -ও অনেক সময় এক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করে। বহির্যৌনাঙ্গের কোন রোগ বা মানসিক কারণে (ভয়, উদ্বেগ, অনীহা ইত্যাদি) ঐ কষ্ট দেখা দেখা দিতে পারে। এছাড়া সংশ্লিষ্ট পুরুষ ও নারী যদি ঋতুচক্রের মাঝামাঝি সময়ে আদৌ মিলিত না হন, অথবা খুবই কম সংখ্যায় মিলিত হন, ত হলেও সন্তান না আসতে পারে।

এছাড়া নারীর যে সব শারীরিক ত্রুটির কারণে বন্ধ্যাত্ব তথা সন্তানহীনতা ঘটতে পারে সেগুলি হল,—

(১) ডিম্বকোষ নির্গমনের ত্রুটি (disorders of ovulation)—শতকরা২০-৩০ ভাগ ক্ষেত্রে এই ত্রুটিই বন্ধ্যাত্বের প্রধান কারণ হিসেবে দেখা দেয়। ডিম্বাশয় (ovary) -র কোন রোগ বা হরমোনজনিত ত্রুটি এর পেছনে ভূমিকা পালন করে। এই সব হরমোনের মধ্যে পিটুইটারি গ্রন্থির রোগও যেমন থাকে, তেমনি থাকে থাইরয়েড গ্ল্যান্ডের কম কাজ তথা থাইরক্সিন হরমোনের স্বল্পতা (hypothyoidism)।

(২) ডিম্বনালী তথা জরায়ুনালীর (Fallopian tube বা uterine tube -এর) ত্রুটি—জীবাণু সংক্রমণ, টিউমার ইত্যাদি কারণে দু'দিকের ডিম্বনালীর পথ যদি অবরুদ্ধ হয়ে যায় তাহলেও সফল যৌনমিলন ও উপযুক্ত সংখ্যক শুক্রকোষের উপস্থিতি সত্ত্বেও ডিম্বকোষ ডিম্বাশয় থেকে বেরিয়ে শুক্রকোষের সঙ্গে মিলিত হতে পারে না। অনেক সময় অস্বাস্থ্যকর ভাবে গর্ভপাত (abortion) করানোর পর এই ধরনের জীবাণুসংক্রমণ ঘটে। 'কুমারী' অবস্থায় অর্থাৎ সামাজিক বিয়ের আগে গর্ভবতী হয়ে গেলে লুকিয়ে, তাড়াহুড়ো করে হাতুড়েদের হাতে গর্ভপাত ঘটালে এই বিপদ ঘটতে পারে। তাই মাঝে মাঝেই দেখা যায়, বিয়ের আগে গর্ভপাত ঘটানোর পর বিয়ের পর আর সন্তান আসছে না, যদিও স্বামীর কোন ত্রুটি নেই। উপযুক্ত ওষুধপত্র বা অস্ত্রোপচার ইত্যাদির সাহায্যে এই ত্রুটি দূর করা যায়।

(৩) জরায়ুর রোগ (endometriosis) —শতকরা ১০-১৫ ভাগ বন্ধ্যাত্বের পেছনে জরায়ুর ত্রুটি ভূমিকা পালন করে। সাধারণত এটি হয় জরায়ুর অভ্যন্তরীণ আবরণীর বিশেষ ধরনের অস্বাভাবিকত্বের কারণে (endometriosis)। বিরল ক্ষেত্রে জন্মগতভাবে অস্বাভাবিক জরায়ুর কারণেও জরায়ুতে ভ্রূণ সুস্থিত হতে পারে না।

(৪) জরায়ুমুখ (cervix) -এর ত্রুটি—শতকার প্রায় ৫ ভাগ ক্ষেত্রে বন্ধ্যাত্বের পেছনে জরায়ুমুখের গঠনগত বা জৈবরাসায়নিক অস্বাভাবিকত্ব বিশেষ ভূমিকা পালন করে। এর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হল শুক্রকোষের সঙ্গে বিরূপ রাসায়নিক ক্রিয়া, তথা জরায়ুমুখের রাসায়নিক

পরিমন্ডল এমনই যা শুক্রকোষকে মেরে ফেলে বা অকার্যকরী করে দেয় (immunological incompatilitity)।

এছাড়াও শতকরা ৪-১০ ভাগ বন্ধ্যাত্বের পেছনে সুনির্দিষ্ট কোন কারণই খুঁজে পাওয়া যায় না (idiopathic)।

সব মিলিয়ে সন্তানহীনতার পেছনে যে সব অজস্র কারণ ভূমিকা পালন করতে পারে, উপযুক্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষায় তা নির্ধারণ করা যায়। এবং উপযুক্ত চিকিৎসায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সংশ্লিষ্ট ত্রুটি দূর করা যায়। বিজ্ঞান সম্মত চিকিৎসা পদ্ধতি অবলম্বন না করে ঠাকুরের থানে মানত করলে বা ষষ্ঠী পুজো করলে কিংবা তাবিজ-মাদুলি ধারণ করে, বিশেষ ঠাকুরের জল বা মাটি খেয়ে, সন্তান লাভ করা সম্ভব নয়। কিন্তু বিজ্ঞান সম্মত চিকিৎসার সুযোগের অভাবে বা ঐ ধরনের মানসিকতার অভাবে, আমাদের মত দেশের বহু সন্তানহীনা নারীই ঠাকুরের থানে দড়িতে ঢিল বেঁধে মানত করেন বা পুজো-আচ্চা-তাবিজ-মাদুলির পেছনে অর্থ ব্যয় করেন।

অনেক সময় দেখা যায় মন্দিরে সারারাত ঠাকুরের কাছে হত্যা দিয়ে পড়ে থাকার পর কোন কোন মহিলা গর্ভবতী হয়েছেন। এর পেছনে ঠাকুরের অলৌকিক মাহাত্ম্য কিছু নেই, যা কিছু মাহাত্ম্য তা ঐ মন্দিরের পুরোহিত বা সেবাইতের শুক্রকোষের। এই সব পুরোহিত-সেবাইতরা অনেক সময় সারারাত উপোস করে পড়ে থাকা ভক্তিমতী ঐ সরল বিশ্বাসী সন্তানহীনাকে প্রসাদের নাম করে নেশার জিনিষ (যেমন ধুতুরা বা ভাঙ, সিদ্ধি ইত্যাদি মিশিয়ে) খাইয়ে দেয়। এর ফলে ঐ মহিলা আচ্ছন্ন হয়ে পড়েন আর ঐ সুযোগে পুরোহিত বা সেবাইত তাঁকে ধর্ষণ করে। ঘোরের মধ্যে থাকা কোন মহিলা হয়তো ব্যাপারটিকে দেবতার সঙ্গে মিলন বলে মনে করেন। কেউ বা ব্যাপারটা বুঝতে পেরেও লোকলজ্জায় চুপ করে থাকেন। দীর্ঘদিন সন্তানহীন থাকার পর এইভাবে গর্ভবতী হয়ে পড়লে, সেটিকে ঈশ্বরের আশীর্বাদ বলেই প্রচার করা হয়। আসলে এসব ক্ষেত্রে মহিলার স্বামীই ছিলেন ত্রুটিযুক্ত,—হয় লিঙ্গ দৌর্বল্য বা শুক্রকোষাস্বল্পতার শিকার, কিন্তু মহিলাটি ছিলেন স্বাভাবিক। এর ফলে এই ধরনের অধ্যাত্মিক-ধর্ষণের ফলে তিনি অনায়াসেই গর্ভবতী হয়ে যান। কিন্তু এটি স্পষ্টভাবে বোঝা দরকার যে কার্তিক থেকে নারায়ণ এই ধরনের নানা নামের কোন দেবতার দৈবী অনুগ্রহেই সন্তানলাভ করা সম্ভব নয়। সন্তানের জননী হতে গেলে প্রয়োজন কোন পুরুষের সবল শুক্রকোষ।

(১৩)

মৌলবাদের জরায়ুসর্বস্বতা

"হে হিন্দু নারী! তুমি ১৭টি সন্তানের জননী হও। তা যদি না পার তবে অন্তত ১২টি সন্তানের জন্ম দাও। ঐ 'হাম দো, হামারা দো'—এর মত পরিবার পরিকল্পনার চক্করে পড়ো না।....."

অবিশ্বাস্য মনে হলেও, আধুনিক বিশ্বের এক নেতৃস্থানীয় ভারতীয় তাঁর ধর্মের নারীদের এমনই নির্দেশ দিয়েছেন। হাস্যকর শোনালেও, ভারতে হিন্দু মৌলবাদীদের সংগঠন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রধান শ্রী কে এস সুদর্শন ২০০৫ সালের নভেম্বর মাসে হিন্দু নারীদের জন্য এমনই ললিতবাণী তাঁর শ্রীমুখ থেকে নির্গত করেছেন। উদ্দেশ্য অস্পষ্ট নয়। এদেশে মুসলিমদের নাকি অনেক বাচ্চাকাচ্চা, তারা নাকি হিন্দুর সংখ্যাকে ছাপিয়ে যাওয়ার উপক্রম করেছে। হিন্দু নারীরাও তাদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বহু সন্তানের জন্ম দিলে তাদের আর বাড় বাড়তে পারবে না। তিনি অঙ্ক কষেও দেখিয়েছেন—সারা জীবনে ১৭ টি সন্তান হয়তো সবার দ্বারা সম্ভব হবে না, কিন্তু ১২ টিও যদি হয় তবে এক হিন্দু দম্পতি একশ' বছরে কমপক্ষে ১২০০ 'হিন্দু' উত্তরসূরী রেখে যেতে পারবে।

আর সুদর্শনের এমন সুভাষিতের সুযোগে মধ্যপ্রদেশে হিন্দু মৌলবাদীদের রাজনৈতিক সংগঠন ভারতীয় জনতা পার্টির মুখ্যমন্ত্রী মহামান্য শ্রী বাবুলাল গৌর পরের দিনই ঠিক করেছেন, দুইয়ের বেশি সন্তানের জনক-জননীদের নির্বাচনে দাঁড়ানোর ব্যাপারে যে নিষেধাজ্ঞা ঐ রাজ্যে ছিল তা তুলে নেওয়া হবে। এই নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ার পেছনে আপাততভাবে যে কারণ দেখানো হচ্ছে, তা অবশ্য খুব একটা অযৌক্তিক নয়। কারণ মূলত সার্বিক শিক্ষা, নারীর সম্মানিত অবস্থান ও স্বাচ্ছন্দ্যের অভাবের কারণে যে দেশে অধিক সন্তানের জন্ম হয়, ঐ ভারতবর্ষের মত দেশে অসফল পরিবার পরিকল্পনার এই পরিবেশে সন্তানের সংখ্যা বড়জোর দুই না হলে নির্বাচনে দাঁড়াতে পারবে না,—এমন নিয়ম বৈষম্যকে আরো শক্তিশালী করে। এই ধরনের একপেশে আইন পরিবার পরিকল্পনার সহায়ক আদৌ হয় না, বরং ভিন্নতর সামাজিক সমস্যা ও দুর্নীতির সৃষ্টি করে। যেমন, দুই সন্তানের এমন ফতোয়ার পর কেউ কেউ তাঁদের সন্তানকে অন্যদের 'দত্তক' দিয়ে দিয়েছে, খাতায় কলমে ত্যাগও করেছে। কিন্তু মহিলাদের ক্ষেত্রে সমস্যাটা বেশি। কারণ সাধারণত কোন মহিলাই শুধু ভোটে দাড়ানোর জন্য নিজের তৃতীয়-চতুর্থ সন্তানাদিকে অন্যের হাতে তুলে দেবে না বা 'ত্যাগ' করবে না।

হিন্দু মৌলবাদীরা যতই ষড়যন্ত্রমূলক কথাবার্তা বলুক না কেন, অধিক সন্তানের জন্ম অনেক হিন্দু বা খৃষ্টান দম্পতিরাও দেয়, যেমন দেয় অনেক মুসলিম দম্পতিও। আসলে

এর সঙ্গে বিশেষ কোন ধর্মের কোন সম্পর্ক নেই। কিন্তু সম্পর্ক আছে অশিক্ষা, দারিদ্র, সামাজিক অসহায়তা, সুস্থ বিনোদনের ও বহির্জগতের সঙ্গে যোগাযোগের অভাব, নারীর অসম্মানিত অবস্থান—এসবেরই। স্বচ্ছল শিক্ষিত মুসলিম দম্পতির সন্তান সংখ্যাও সীমিত। অশিক্ষিত দরিদ্র হিন্দু দম্পতির সন্তান সংখ্যাও বেশ বেশি। এদেশে মুসলিমদের মধ্যে আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষা ও ঐ অনুসারি মানসিকতা তুলনামূলক ভাবে কম থাকার কারণে আপাত ভাবে দেখা যায় কিছু মুসলিম পরিবারে সন্তান সংখ্যা বেশ বেশি,—বিশেষত বস্তিতে বা গ্রামে। একইভাবে তা বেশি অন্য ধর্মাবলম্বীদের মধ্যেও। এটি প্রমাণিত যে, শিক্ষিত স্বচ্ছল পরিবারে, বিশেষত যে সব পরিবারে নারীরা শিক্ষিত, বাইরের জগতের সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন, হয়তো বা উপার্জনশীলও, ঐসব পরিবারের দম্পতির সন্তানসংখ্যা সীমিতই—এক বা বড়জোর দুই। ঐ পরিবার ধর্মের ভিত্তিতে হিন্দু, মুসলিম, খৃষ্টান—যাই হোক না কেন তা সত্য। আসলে হিন্দুমৌলবাদীরা অন্ধ মুসলিম বিরোধিতার কারণে চোখে ঠুলি পরে থাকে,—সমাজ বিজ্ঞানের এই সহজ, প্রমাণিত সত্য ও তথ্যকে দেখেও দেখে না।

আর সম্প্রতি এটিও প্রতিষ্ঠিত যে বর্তমান বিশ্বের সমস্ত দেশেই সন্তানসংখ্যা সীমিত রাখাটা অতি প্রয়োজন। জনসংখ্যা একটি সীমার মধ্যে না থাকলে পৃথিবীর প্রাকৃতিক পরিবেশ যেমন বিপর্যস্ত হতে থাকবে, তেমনি পৃথিবীর সম্পদেও ঘাটতি দেখা দেবে তথা সবার মুখে অন্ন, পরণে বস্ত্র, আশ্রয়ের জন্য বাসস্থানের ব্যবস্থা করা দুরূহ হতে থাকবে। ফলত বাড়বে হানাহানি ও বৈষম্য। তা সে জলের জন্যই হোক, তেলের জন্যই হোক, বা আশ্রয়স্থল ও খাদ্যের জন্যই হোক। এখন থেকে কয়েক শ'বছর আগে বা পৌরাণিক সময়ে এই অবস্থা ছিল না। তখন সামাজিক প্রয়োজনেই অধিক বংশধরের উপর জোর দেওয়া হত, যার প্রতীকী বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল 'শতপুত্রের জননী হও' জাতীয় আশীর্বাণীর মধ্যে। এখন ঐ প্রয়োজন ফুরিয়েছে। প্রাকৃতিক ভাবেই মানুষ সহ যে কোন প্রাণীর সংখ্যাই একটি বিশেষ সীমার মধ্যে থাকতে বাধ্য। এই সীমা অতিক্রম করলেই ঐ প্রজাতির একটি অংশ ধ্বংস হতে থাকে, ফিরে আসে ভারসাম্য। মানুষ অন্যান্য প্রাণীর চেয়ে বেশি বুদ্ধিমান ও কৌশলী বলে একটি স্তর অব্দি ঐ সীমাও সে অতিক্রম করার সাহস দেখাতে পারছে,—রোগের বিরুদ্ধে লড়াই করে, বহুতল বাড়ি বানিয়ে, অধিক ফসল ফলিয়ে, অধিক উৎপাদন করে। কিন্তু এই সাহস যে দুঃসাহস তা প্রমাণিত হচ্ছে,—একাজের দ্বারা বহু সহস্র বছরের পৃথিবীর প্রাকৃতিক পরিবেশ মানুষের হাতে স্থায়ীভাবে ধ্বংস হওয়ার মধ্য দিয়ে, জল-তেল-খাদ্যের মত পৃথিবীর সম্পদের জন্য যুদ্ধ ও হানাহানির মধ্য দিয়ে। এইভাবেই হয়তো জনসংখ্যার সীমা অতিক্রম করার যে সমস্যা তার সমাধান হবে। কিন্তু তা কখনোই কাম্য নয়। মানুষে মানুষে যুদ্ধ ও হানাহানির মধ্য দিয়ে জনসংখ্যা কমানোর চেয়ে, মানুষ আগে থেকেই নিজের সংখ্যা সীমিত রাখলে ঐ অবাঞ্ছিত হিংস্র পদ্ধতি এড়ানো সম্ভব। আর এসব মিলিয়েই বর্তমান বিশ্বে জনসংখ্যার সীমায়নের উদ্যোগ, তথাকথিত পরিবার পরিকল্পনার নানাবিধ প্রক্রিয়ার প্রবর্তন। মানুষের স্বাভাবিক যৌন চাহিদা

তথা প্রজনন ক্ষমতা অক্ষুন্ন রেখেই সন্তানসন্ততির সংখ্যা সীমিত করার নানা বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি মানুষই আবিষ্কার করে অনুসরণ করছে।

এই অবস্থায় উল্টোদিকে হেঁটে, হিন্দু মৌলবাদীদের মধ্যযুগীয় ফতোয়া সমগ্র মানব সমাজের পক্ষেই বিপজ্জনক। সুদর্শনদের বহু সহস্র অনুগামীদের একটি সীমিত অংশও যদি এর দ্বারা উৎসাহিত হয়ে বহু সন্তানের জন্ম দিতে থাকে, তবে তা এদেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক সঙ্কট যেমন তীব্রতর করবে তেমনি তা সমগ্র মানবজাতির কাছেও হবে একটি অশনি সংকেত। এবং শুধু হিন্দুমৌলবাদীদের নয়, মুসলিম মৌলবাদীরা বা অন্যরাও যদি ঐ ধরনের সংকীর্ণ উদ্দেশ্যে এই ধরনের উপদেশ দেয়, তবে সেটিরও প্রতিরোধ করা দরকার দৃঢ়ভাবে। আর সত্যিই শোনা গেছে সুদর্শনদের দোসর কিছু মৌলবি ও মুসলিম নেতারাও নাকি ঐভাবে মুসলিমদের সংখ্যা বাড়ানোর বিপজ্জনক ও কদর্য উপদেশ ও উস্কানি দিয়ে থাকে।

তবে ব্যাপারটি নিছকই জনসংখ্যার স্ফীতি আর সামাজিক অর্থনৈতিক সমস্যার মধ্যে সীমিত নয়। এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে এইসব ধর্মের দ্বারা নারীর অবমূল্যায়ন ও লাঞ্ছনার ব্যাপারটিও। একজন নারীকে এক ডজনেরও বেশি সন্তানের জন্ম দিতে বাধ্য করলে, স্পষ্টতই তাঁর জীবনের সবচেয়ে সক্রিয় অংশটিই ব্যয় হবে সন্তানের জন্ম দেওয়া, পালন করা, আবার সন্তানের জন্ম দেওয়ার চক্রের মধ্যে। তাঁর মেধা, সৃজনশীলতা ও সমাজ-সংস্কৃতির অন্যান্য দিকে তাঁর অবদান রাখার ক্ষমতা—এসবগুলিই সম্পূর্ণ অবদমিত হবে কঠোরভাবে। সুদর্শন-জাতীয় মৌলবিরা এটাই চায়। নারী তাদের কাছে প্রজননের যন্ত্র মাত্র। প্রতি নারীর কাছেই সন্তান কাম্য। কিন্তু এই সন্তান কবে আসবে ও ক'টি আসবে এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়ার চূড়ান্ত অধিকার থাকা দরকার সংশ্লিষ্ট নারীরই। নিজের জরায়ুকে কতবার গর্ভবতী করবেন, নিজের স্তন্য দু'টিকে কতবার অমৃতবর্ষী করবেন—এটি ঠিক করবেন তিনিই।

ধর্মীয় মৌলবাদীদের সংকীর্ণ ধান্দার শিকার হওয়ার হাত থেকে নারীদের বাঁচানো দরকার। এই বাঁচার লড়াই করা দরকার মূলত নারীদেরই। একজন নারী যে পুরুষের যৌন চাহিদা মেটানোর ও নিজ ধর্মের মানুষের সংখ্যা বাড়িয়ে নেতৃবৃন্দের আখের গোছানোর জরায়ু-সর্বস্ব যন্ত্র নয়—এটি নিজেদেরই প্রবলভাবে অনুভব করা প্রয়োজন।

এদেশে মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধির তথ্যও আসলে হিন্দুমৌলবাদীদের মিথ্যাচার

প্রকৃত তথ্য হল বর্তমানে ভারতবর্ষের হিন্দু ও মুসলিম উভয় সম্প্রদায়েরই জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমছে। হ্যাঁ, মুসলিমদেরও। ১৯৬১ থেকে ১৯৭১ সালের মধ্যে হিন্দুদের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল ২৩.৪ শতাংশ। ১৯৭১-৮১ সালে ২৪.২ শতাংশ ও ১৯৯১-০১ সালে ২০.০ শতাংশ। অর্থাৎ চল্লিশ বছরে হিন্দুদের বৃদ্ধির হার কমেছে ৩.৪ শতাংশ। অন্যদিকে মুসলিমদের সংখ্যা ১৯৬১-৭১ সালে বেড়েছিল ৩১.২ শতাংশ হারে, ১৯৯১-২০০১ সালে ২৯.৩ শতাংশ হারে। অর্থাৎ বিগত চল্লিশ বছরে মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমেছে ১.৯ শতাংশ। হিন্দু ও মুসলিম—সব ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মৌলবাদীরাই নোংরামিতে আর নারীদের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গীতে মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ মাত্র। তার জন্য তারা মিথ্যাচার, তথ্যবিকৃতি, বাস্তব সমস্যাকে উপেক্ষা করা—কোন কিছু করতে পিছপা হয় না।

(১৪)

প্রজনন বিজ্ঞান প্রশিক্ষণ—সচেতনতা ও সম্মানের শিক্ষা

বর্তমানে যৌন শিক্ষা (sex education) বিদ্যালয় স্তরের ছাত্র ছাত্রীদের দেওয়া হবে কিনা তা নিয়ে এদেশে ঘোর বিতর্ক শুরু হয়েছে। অনেকে আবার এধরনের পাঠক্রমের নামের মধ্যে যৌন বা সেক্স কথাটা রাখার ব্যাপারে দ্বিধায় আছেন। তাই বিষয়টির নাম 'জীবনশৈলী' জাতীয় রাখার কথা বলছেন। তবে বিকল্প নাম হিসেবে প্রজনন বিজ্ঞান প্রশিক্ষণ (study of reproductive science)-এর কথাও ভাবা যেতে পারে। কারণ পাঠ্য হিসেবে বিজ্ঞানের অংশ হিসেবে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে তা দেওয়া দরকার। এক্ষেত্রে ' যৌন' কথাটার মধ্যে পুরো পাঠক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পরিষ্কার হয় না। যৌনতার বাপারটিই যেন প্রধান হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু এই ধরনের শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য তরুণতরুণীদের মানুষের প্রজনন প্রক্রিয়া সম্পর্কে বিজ্ঞানসম্মত ধারণা দেওয়া; এই প্রজননের জন্যই যৌনতা তথা যৌন আবেগ ও ইচ্ছা তার ভূমিকা পালন করে মাত্র।

মানুষের নিজ প্রজনন প্রক্রিয়া পড়ানোটা কিশোর-কিশোরীদের উচিত হবে কিনা—এই নিয়েই যত দ্বিধা ও সতর্কতা। না হলে বিদ্যালয় স্তরেই ছাত্রছাত্রীরা বিভিন্ন নিম্ন প্রাণীর জননাঙ্গ ও জনন প্রক্রিয়া সম্পর্কে পড়াশোনা করেই। এ নিয়ে জীবন বিজ্ঞান (life science) বইতে আলাদা পরিচ্ছেদই আছে। কিন্তু নিম্ন প্রাণীর জননাঙ্গ ও প্রজনন প্রক্রিয়া সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান বিদ্যালয় স্তরেই লাভ করলেও, নিজেদেরটার সম্পর্কে তাদের সম্যক ধারণা থাকে না। তার ফলে নানা ধরনের অবৈজ্ঞানিক ধারণা যেমন তাদের মধ্যে জন্ম নেয় তেমনি যৌনাঙ্গ ও যৌনক্রিয়ার সুস্বাস্থ্য বজায় রাখার ব্যাপারেও তারা অজ্ঞ থাকে। অন্যদিকে ঘটে প্রাক্‌যৌবন যৌনমিলনের নানাবিধ শারীরিক ও মানসিক বিপদ ও গর্ভনিরোধের পদ্ধতি জানা না থাকায় অবাঞ্ছিত গর্ভ থেকে শুরু করে এইডস ও নানা যৌন রোগের প্রসারও। শরীর সম্পর্কে সচেতন না থাকায় কখনো বা নিছক আবেগের বশে ঘটিয়ে ফেলে নিজের বিপদ, কখনো বা শিকার হয় সুযোগসন্ধানী বয়স্ক পুরুষ বা বয়স্কা নারীর।

এ অবস্থায় যৌন শিক্ষা বা জীবনশৈলী শিক্ষা বা প্রজনন বিজ্ঞান প্রশিক্ষণ— যে নামেই ডাকা হোক না কেন ,তার মাধ্যমে মানুষের নিজ প্রজনন প্রকৌশল মানবসন্তানের যৌনচেতনা উন্মেষের সময় থেকেই দেওয়া দরকার। অনেক সময় মায়েরা মেয়েদের এ ব্যপারে কিছুটা সচেতন করেন। কিছু আদিবাসী গোষ্ঠীর মানুষও ' ঘোটুল'-এ যাওয়ার আগে তরুণতরুণীদের এ ব্যাপারে শিক্ষা দেন। কিন্তু সাধারণভাবে এই শিক্ষার ও সচেতনতার

ক্ষেত্রেই ঘাটতি অনেক আছে।

বয়ঃসন্ধির সময় থেকেই যৌনচেতনার উন্মেষ ঘটে—বিপরীত লিঙ্গের প্রতি, বিশেষ করে মেয়েদের প্রতি ছেলেদের মধ্যে সৃষ্টি হয় তীব্র ঔৎসুক্য ও প্রবল আগ্রহ। স্বাভাবিকভাবে এই ঔৎসুক্য না মেটানো হলে নানা ধরনের বিকৃত পথে তা মেটানোর চেষ্টা চলে। মানসিক আবেগ ও শরীরী যৌনতা সম্পৃক্তভাবে মিশে থাকলেও ছেলেদের ক্ষেত্রে দ্বিতীয়টির দিকে ও মেয়েদের মধ্যে প্রথমটির দিকে পাল্লা ভারি থাকে। শারীরিকভাবে ছেলেদের দ্বারা মেয়েদের যৌন নিগৃহীত হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি, মেয়েদের দ্বারা ছেলেদের যৌন নিগৃহীত হওয়ার ঘটনা ঐ তুলনায় বিরল। কখনো কখনো বয়স্কা নারীর হাতে কোন কমবয়সী ছেলের নিগৃহীত হওয়ার ঘটনার কথা শোনা গেলেও তা নেহাতই বিরল ব্যতিক্রম ও এক ধরনের বিকৃতি মাত্র। সাধারণভাবে নানা বয়সের পুরুষের দ্বারাই নানা বয়সের মেয়ের যৌন নিগ্রহ ঘটে, এমনকি বয়ঃসন্ধির বয়সেই তীব্র যৌন কৌতূহল ও আগ্রহের বশে কোন কোন ছেলে যৌনকর্মীর কাছেও চলে যায়। এর ফলে শুধু এইডস-এর মত মারণরোগের বিস্তারই বৃদ্ধি পায় না, আর্থিক ও মানসিক কারণে নানা ধরনের অসামাজিক অপরাধমূলক কাজকর্মে জড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনাও বাড়ে।

এ অবস্থায় বিদ্যালয়ে ও বাড়িতে উপযুক্ত সচেতনতা ও শিক্ষাদানের দ্বারাই এ ধরনের বিপদ আটকানো যেতে পারে। যৌনতার দিকটি চিরকাল থাকলেও এতদিন হয়তো এ ধরনের সুস্পষ্ট পাঠক্রমের প্রয়োজন হয় নি। এর একটি বড় কারণ এইডস-এর মত মারণ রোগের ব্যাপারটিই আগে ছিল না। অন্যদিকে যৌন সুড়সুড়ি দেওয়া চলচ্চিত্র, নাচ, বিজ্ঞাপন, দূরদর্শনের নানা ধারাবাহিক, তথাকথিত সাহিত্য ইত্যাদির প্রকোপও সম্প্রতিকালে বিপুলভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এই কিছুদিন আগেও চলচ্চিত্র বা সাহিত্যের মধ্যে বড় অংশ জুড়ে থাকত প্রেম, এখন তার স্থান নিয়েছে শরীর তথা যৌনতা। এর ফলে বয়ঃসন্ধির স্বাভাবিক যৌনচেতনা শরীরসর্বস্ব হওয়ার সম্ভবনাও বৃদ্ধি পেয়েছে। বৃদ্ধি পেয়েছে অপরিণত বয়সের যৌনতা তথা যৌনমিলন। সাম্প্রতিক চলচ্চিত্র, বিজ্ঞাপন, সাহিত্য ইত্যাদির সিংহভাগ অংশেই নারীদের দেখানো হচ্ছে পুরুষের যৌনতা মেটানোর একটি জীবন্ত যন্ত্র, শরীর সর্বস্ব প্রাণী হিসেবে। এই অবস্থায় মেয়েদের প্রতি সম্মানবোধ ও সহমর্মিতা তথা বন্ধুত্বের মানসিকতার চেয়ে তার শরীরী আবেদনই ছেলেদের মধ্যে বড় হয়ে দেখা যাচ্ছে। এর অর্থ এ নয় যে, আগে নারী নিগ্রহ, ধর্ষণ, বারাঙ্গনা গমন ইত্যাদি ছিল না। রামায়ণ-মহাভারতের দেবদেবী মুনিঋষি থেকে শুরু করে ধর্মীয় গুরু, নেতা আর সাধারণ মানুষ— সবাইই এ ব্যাপারে বেশ সরেস। কিন্তু সম্প্রতিকালে উল্লম্ফনের ভঙ্গীতে যেভাবে খোলাখুলি শরীর সর্বস্বতা ও যৌন সুড়সুড়ি দেওয়ার সার্বিক আয়োজন এবং তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে বয়ঃসন্ধির বয়স হতে না হতেই ধর্ষণ ও যৌনবিকৃতি তথা সমকামী ও

বিষমকামী যৌনতা শুরু হয়েছে, তা অবশ্যই চোখে পড়ার মত। এইডস-এর মত মারণ রোগের বিস্তার হয়তো এরই ফল এবং মানবপ্রজাতির প্রতি প্রকৃতির ইতিবাচক সতর্কবার্তা।

এবং এইভাবে পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটেছে বলেই আধুনিক সমাজে বিদ্যালয় স্তরে যৌনশিক্ষা বা প্রজনন বিজ্ঞান প্রশিক্ষণের ব্যাপারটি প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে। অনেকে ভয় করছেন, এর ফলে কমবয়সী ছেলে-মেয়েদের মধ্যে অবাধ যৌনতা-র চিন্তা ঢুকবে এবং তারা যৌনক্রিয়কলাপে লিপ্ত হয়ে পড়বে। যা জানত না, তাও জেনে ফেলে তারা বুঝি অকালপক্ক ও বিকৃত যৌন আচরণ করতে শুরু করবে। এই ভয় কতটা যৌক্তিক তা নিয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে।

আসলে যৌনতাকে ঘিরে আমাদের দেশে যে ধরনের রক্ষণশীলতা ও ঢাকঢাক-গুড়গুড় মানসিকতা আছে, মূলত তারই প্রতিফলন ঘটে, এই ধরনের আশঙ্কার মধ্যে। এই রক্ষণশীল মানসিকতার জন্য শিক্ষক-শিক্ষিকারা প্রাসঙ্গিক পরিভাষা ও বর্ণনাগুলি ছাত্রছাত্রীদের সামনে উচ্চারণ করতে সঙ্কোচ বোধ করেন। পাশাপাশি রয়েছে, বিশেষত মেয়েদের শরীরের শুদ্ধতা, পবিত্রতা ও সতীত্ব সম্পর্কিত কিছু একপেশে ধারণাও। যৌনতা সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত ব্যাপার। প্রকাশ্য যৌনক্রিয়ার মধ্যে এক ধরনের অশালীন, অশোভন ব্যাপার জড়িয়ে থাকলেও ছেলেমেয়েদের সঙ্গে শিক্ষামূলক ভাবেই হোক বা বন্ধুত্বপূর্ণ মানসিকতা নিয়েই হোক, যৌনতা সম্পর্কিত কথাবার্তা বলার মধ্যেও চূড়ান্ত সঙ্কোচ ও অনীহা কাজ করে। অথচ চারপাশের পরিবেশ পাল্টে ছে। তাদের সামনে প্রচলিত সাংস্কৃতিক পরিমন্ডল ('অপ সাংস্কৃতিক'!) বিজ্ঞাপন ও চলচ্চিত্রের মাধ্যমে যৌন সুড়সুড়ি দেওয়ার কাজও চলছে। বিশেষত ঘটছে নারীশরীরের তথা সামগ্রিকভাবে নারীদের প্রতি চূড়ান্ত অপমান ও অবমাননার কাজ। এ অবস্থায় প্রয়োজন একদিকে যৌনতার ব্যাপারে ছেলেমেয়েদের সচেতন করা, অন্যদিকে বিশেষত নারীর প্রতি সুস্থ সঠিক দৃষ্টিভঙ্গীর ও সম্মান জানানোর মানসিকতা গড়ে তোলার কাজও। তাই যান্ত্রিকভাবে যৌন শিক্ষা বা প্রজনন বিজ্ঞানের প্রশিক্ষণ না দিয়ে একইসঙ্গে মানবিক মূল্যবোধের প্রশিক্ষণ এবং কিভাবে বর্তমান পুঁজিবাদী ব্যবস্থা নারীকে শুধু শরীর সর্বস্ব ভোগ্য প্রাণীতে পরিণত করছে সে সম্পর্কেও সচেতন করা প্রয়োজন। যৌনশিক্ষা (বা জীবনশৈলী শিক্ষা বা প্রজনন বিজ্ঞান প্রশিক্ষণ) যৌনবিকৃতির ও উচ্ছৃঙ্খল যৌনতার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের হাতিয়ার হিসাবেও ব্যবহার করা উচিত এবং এর মধ্য দিয়ে ছাত্রছাত্রীরা যাতে সুস্থ জীবনবোধে প্রশিক্ষিত হতে পারে তার আয়োজন করা প্রয়োজন।

এক্ষেত্রে এই ধরনের কিছুদিকের কথা ভাবা যেতে পারে,—

(১) নবম শ্রেণীর স্তর থেকে এই ধরনের পাঠক্রম শুরু করা ;

(২) মানুষের শরীর স্থান (anatony)-র প্রাথমিক ধারণার সঙ্গে যৌনাঙ্গের বিবরণ;

(৩) যৌনাঙ্গের ও যৌনমিলনের পেছনে জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়া (physiological ও biochemical basis) সম্পর্কে ধারণা দেওয়া;

(৪) অপরিণত বয়সে যৌন মিলনের শারীরিক ও সামাজিক বিপদ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করা ;

(৫) এইডস ও তার প্রসার কিভাবে ঘটে সে সম্পর্কে ধারণা দেওয়া;

(৬) গর্ভ সঞ্চার কিভাবে হয় সে সম্পর্কে ধারণা দেওয়া;

(৭) এইডস ও অবাঞ্ছিত গর্ভ প্রতিরোধের জন্য কণ্ডোমের ব্যবহার ও অন্যান্য প্রক্রিয়া সম্পর্কে সচেতন করা;

(৮) জীবনে রোগের বিরুদ্ধে লড়াই এবং খাদ্য-বস্ত্র বাসস্থান শিল্প সাহিত্য-এর প্রয়োজনীয়তার পাশাপাশি যৌনতা যে অন্যতম একটি দিক মাত্র তা জানানো;

(৯) পুরুষতান্ত্রিকতা ও সামন্ততান্ত্রিক, পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থায় নারীর অবমূল্যায়ন সম্পর্কিত ধ্যান ধারণা দেওয়া;

(১০) যৌনতা সম্পর্কিত বিভিন্ন কুসংস্কার ও রক্ষণশীলতার বিরুদ্ধে আলোচনা করা ইত্যাদি।

তবে নবম শ্রেণীর তথা ১৩-১৪ বছর বয়সের আগেই অনেক শিশু তাদের বাবা-মায়ের কাছে নিজেদের জন্ম কিভাবে হল তা নিয়ে নানাবিধ প্রশ্ন করে। এক্ষেত্রে বাবা-মায়ের পক্ষে সবকিছু ব্যাখ্যা করা সম্ভব হয় না, অনেকে 'আকাশ থেকে এসেছ' বা 'হাসপাতাল থেকে এনেছি' জাতীয় মিথ্যাচারের আশ্রয় নেন। কোন নাছোড়বান্দা শিশু আবার 'হাসপাতালেই বা আমি কোত্থেকে এলাম' জাতীয় প্রশ্ন করে ঝামেলা পাকিয়ে তোলে। তখন মুস্কিল হয়। কখনো হঠাৎ বাবা-মায়ের যৌনমিলন দেখে ফেললে বা রাস্তাঘাটে জীবজন্তুর যৌনমিলন দেখার পরও তাদের কৌতূহল প্রকাশ করে। তখন মুস্কিল হয় আরো।

মুস্কিল এক্ষেত্রে আছেই। একটি শিশুর পক্ষে সব কিছু বোঝা সম্ভব নয় (অবশ্য কোন মানুষের পক্ষেই তা নয়)। একটি শিশু যদি 'আকাশে কিভাবে এরোপ্লেন ওড়ে' জাতীয় প্রশ্ন করে তবে বায়ুর চাপ থেকে শুরু করে পদার্থবিজ্ঞানের নানা খুঁটিনাটি তাকে বোঝানো বৃথা। একটি অশিক্ষিত পূর্ণবয়স্ক মানুষকেও তা বোঝানো সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে এরোপ্লেনে গ্যাস থাকে আর ঐ গ্যাস জ্বলে গিয়ে এরোপ্লেন চালায় জাতীয় কথাবার্তার দ্বারাই কৌতূহল মেটাতে হয়। কিন্তু তাই বলে ব্যাপারটিকে ঈশ্বরের লীলা বা এরোপ্লেনে যে পাইলট থাকে সে-ই গায়ের জোরে চালায় জাতীয় কথাবার্তা বলাটা সঙ্গত নয়। একইভাবে সঙ্গ ত নয় 'আমি কোত্থেকে এলাম' জাতীয় প্রশ্নের পর 'ভগবান বা হাসপাতাল তোমাকে দিয়েছে' জাতীয় কথাবার্তা বলাও। এর ফলে শুধু একটি অবৈজ্ঞানিক ধারণা শিশুর মনে

ঢোকানো হয় তা নয়, শিশুটির মনের মধ্যে বড়দের ঐ ধরনের উত্তর যদি গেঁথে যায় এবং পরবর্তীকালে সে সত্যি ব্যাপারটা জানতে পারে, তবে বড়দের প্রতি তার অবিশ্বাসও সৃষ্টি হবে। আবার যৌনমিলনের কথা এবং এর ফলে বাবার শুক্রকোষ মায়ের জরায়ুতে দেওয়ার পর মায়ের ডিম্বকোষের সঙ্গে তার মিলনে ভ্রূণের সৃষ্টি আর এই ভ্রূণই মায়ের পেটে বড় হয়ে শিশুর জন্ম দিয়েছে—এই ধরনের গুরুগম্ভীর উত্তর দিয়েও কিছু লাভ নেই। শিশুটি কিছুটা বুঝবে, কিছুটা বুঝবে না। সবই জগাখিচুড়ি পাকিয়ে যাবে।

তাই বয়স ও সচেতনতার স্তর অনুযায়ী শিশুদের প্রশ্নের উত্তর দেওয়াটা প্রয়োজন। এখানে সুনির্দিষ্ট ফর্মূলা অনুযায়ি উত্তরের কাল্পনিক বয়ান তৈরি করা মুস্কিল। আবার পুরো এড়িয়ে যাওয়াও মুস্কিল। তবে সেক্ষেত্রে সন্তানের জন্মের পেছনে বাবা-মা ও তাঁদের ভালোবাসার সম্পর্কের কথা অবশ্যই বলা দরকার। এই ভালোবাসার তাগিদেই যে বাবা ও মা উভয়ে মিলে তাঁদের সন্তানের জন্ম দিয়েছেন কিংবা বাবার শরীরের একটি অংশ মাকে দেওয়ার ফলেই মায়ের শরীরে উভয়ে মিলে সন্তানের সৃষ্টি হয়েছে,—এমন বহুভাবেই শিশুর কৌতূহল মেটানোর চেষ্টা করা যায়।

তবে এর জন্য আগে দরকার এ ব্যাপারে পরিষ্কার ধারণা। ছাত্রছাত্রীদের পড়ানোর ক্ষেত্রেও শিক্ষক-শিক্ষিকাদের প্রয়োজন অনেক স্বচ্ছ ও সংস্কারমুক্ত দৃষ্টিভঙ্গী।